রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে
ইসলামী শরীয়তের একমাত্র বিধান

উন্মুক্ত তরবারী

(উসূলে তাকফীরসহ)

শায়খুল হাদীস মুফতী
মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শায়খুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে
ইসলামী শরীয়তের একমাত্র বিধান

(উসূলে তাকফীরসহ)

শায়খুল হাদীস মুফতী
মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৩ ইং

মূল্য: ৪০ (পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Unmukto tarbari
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 40.00 Tk. US.$ 2.00

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহ:

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ
১২) সিয়াম ও ঈদ:
বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?
১৩) কিতাবুদ দাওয়াহ
১৪) উন্মুক্ত তরবারী

সূচীপত্র

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই প্রসংশা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থণা করি। এবং তার কাছেই হেদায়েত চাই। আমরা আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভূল-ভ্রান্তি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা, আল্লাহর কালাম (আল্লাহর কথা)। আর সর্বাধিক উত্তম আদর্শ, মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ। সর্বাধিক উত্তম কাজ, কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কাজ। আর সর্বাধিক মন্দ কাজ, কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বিদ'আত কাজ এবং সকল বিদ'আত গোমরাহী আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির শুরু থেকেই অনেক বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু কেউ তার চরিত্র নিয়ে কোন কটুক্তি করতে পারেনি। মক্কার কুখ্যাত নেতা আবু লাহাব, আবু জাহেলরা যতই বিরোধিতা করুক তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান চরিত্রের উপর কোনো প্রকার আপত্তি করেনি। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম নামধারী একদল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানপাপী, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পাঁ-চাটা গোলাম তথা কথিত ব্লগার চক্র মক্কার কুখ্যাত কাফের আবু জাহেল, আবু লাহাবদেরও হার মানিয়ে মুহাম্মাদ (সা.) এর বিরূদ্ধে কাল্পণীক কিচ্ছা-কাহিনী তৈরী করে নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কটুক্তি করে যাচ্ছে। দাউদ হায়দার (রঙ্গিলা রাসূলের লিখক), সালমান রুশদী (দি স্যাটানিক ভার্সেসের লিখক), তাসলিমা নাসরীন, হুমায়ুন আজাদ (পাক সার জমিন সাদ বাদ প্রবন্ধের লিখক), আহাম্মক শরীর (আহম্মদ শরিফ), কবি শামসুর রহমান, কবির চৌধুরী, ড. জাফর ইকবাল গংদের একদল ভাবশিষ্য আহমদ রাজীব ওরফে থাবা বাবা, আসীফ মহিউদ্দিন, অরিফুর রহমান, ইবরাহীম খলীলসহ কিছু ব্লগার আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ন বিধান ও আহকামকে নিয়ে এমন কিছু কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে যা কোনো সভ্য মানুষ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না।

এর মাধ্যমে মূলত দেশি-বিদেশি কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। কারণ বর্তমান যুগে কেউ যদি কাফের-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় এবং তাদের আস্থাভাজন হতে চায় তার জন্য সহজ উপায় হলো ইসলামের বিরূদ্ধে অথবা স্বয়ং আল্লাহর বিরূদ্ধে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। নতুন প্রজন্মের অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ঈমান, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্যের বিষয়গুলোকে উৎখাত করে তার পরিবর্তে ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরী করাই এদের মূল টার্গেট। এভাবে ইসলামকে এবং ইসলামের সকল বিষয়গুলোকে বিতর্কিত করার মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলাম ও মুসলিমকে নির্মূল করাই এদের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের মালালা কাহিনী, বাংলাদেশের শাহবাগের প্রজন্ম কাহিনী ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও নাস্তিক-মুরতাদদের সেই নীল নকশারই বাস্তব রূপ। বিশেষ করে বাংলাদেশকে তুরস্কের মতো তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষ (মূলত ইসলাম বিদ্বেষী) একটি রাষ্ট্র বানাতে একদল মানুষ উঠে পরে লেগেছে। এরা কোনোভাবেই ইসলাম, মুসলিম, আল্লাহ, মুহাম্মদ ইত্যাদি নাম পর্যন্ত বরদাশত করতে পারে না। সে কারণে 'নজরুল ইসলাম' হল থেকে 'ইসলাম' কেটে শুধু নজরুল হল, 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' থেকে 'মুসলিম' শব্দ কেটে দিয়ে শুধু 'সলিমুল্লাহ হল', সর্বোপরি সংবিধান থেকে 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা' মুছে ফেলে দিয়ে এখন মুসলিমদের অন্তর থেকেও এগুলো মুছে ফেলার জন্য পাঁয়তারা চলছে। এহেন মূহুর্তে এই সব ইসলামের দুশমনদের মুখোশ উম্মোচন করে দিয়ে তাদের সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সোচ্চার করা এবং তাদের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রতিটি মুসলিমদের উপর ঈমানী দায়িত্ব। সে দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এ বইতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মহান চরিত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্তমান যুগের মুসলিম নামধারী নাস্তিক-মুরতাদদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ জাতীয় নাস্তিক-মুরতাদদের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের ফয়সালা ও বিধান আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ও পঞ্চম অধ্যায়ে ঈমান ভঙ্গের কারণ ও উসূলে তাকফীর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ (সুব.) আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল নাস্তিক-মুরতাদদের বিরূদ্ধে সীসাঢালা লৌহ প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মোকাবেলা করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী
তারিখ : ০৫-০৩-২০১৩ ইং

প্রথম অধ্যায়

রাসুল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য :

দুনিয়ার নিয়ম হলো কাউকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার আগে তার চারিত্রিক সনদ তলব করা হয়। এজন্য এলাকার কমিশনার অথবা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যানগণ সার্টিফিকেট প্রদান করেন। যাতে লেখা থাকে, 'আমার জানা মতে লোকটি সৎ চরিত্রের অধিকারী', যদিও অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাদের নিজের চরিত্রেরই কোনো খবর থাকে না। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ (সুব.)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" (ক্বলাম ৬৮:৪)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী আয়শা (রাঃ) এর বক্তব্যঃ

'সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের বলেন, 'আমি আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে বললাম, আমাকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তার চরিত্র তো হুবহু কুরআন। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী পড়নি? 'আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত" (সূরা ক্বলাম, ৬৮:৪)।'(মুসনাদে আহমাদ ২৪৬০১, ২৫৩০২, ২৫৮১৩)

মূলতঃ একজন মানুষের সঠিক চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী-ই ভালো জানেন। নিজের মূল চরিত্র অন্যদের কাছে গোপন রাখা সম্ভব হলেও স্ত্রীর কাছে গোপন থাকে না। সে কারণেই হয়তো ঐ ব্যক্তি আয়েশা (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে সাহাবীদের বক্তব্যঃ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা-রেখা লঙ্ঘন না হলে কখনো নিজের প্রতি জুলুম-নির্যাতনের কোনো প্রতিশোধ নিতে আমি

দেখিনি। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত তিনি কখনো স্বীয় হাত দ্বারা কাউকে প্রহার করেননি এবং তিনি কখনো কোনো সেবক বা স্ত্রীকে প্রহার করেননি।' (মুসলিম ৪২৯৬)

আল্লাহর রাসুল (সা.) এর খাদেম আনাস (রা.) এর বক্তব্যঃ

'আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো 'উহ' (বিরক্তিসূচক শব্দও) করেন নি। কোনো কাজের জন্য কখনো তিনি বলেন নি, এই কাজটি কেনো করনি বা এই কাজটি কেন করেছো।' (বুখারী ৬১৫১; মুসনাদে আহমদ ১৩০২১)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে অমুসলিমদের বক্তব্যঃ

1. Encyclopedia Britannica confirms:

'.... A mass of detail in the early sources show that he was an honest and upright man who had gained the respect & loyalty of others who were like-wise honest and upright men." (Vol. 12)

'Muhammed (Muhammad [pbuh]) was the most successful of all religious personalities" (4th and 11th editions)

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় মুহাম্মাদ(সাঃ) কে নিয়ে বলা হয়েছে যে,

'...পূর্ববর্তী বহু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মাদ (সা.) একজন সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন।' (খন্ড ১২)

'বস্তুত, মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সর্বাধিক সফল একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।" (চতুর্থ এবং একাদশ সংস্করণ)

2. Sir Thomas Carlyle said in a lecture entitled 'Heroes and Hero worship" in May, 1840:

"Muhammad was the man of truth and fidelity, true in what he did, in what he spoke, in what he thought; always meant something, a man rather taciturn in speech, silent when there was nothing to be said, but

pertinent, wise, sincere, when he did speak, always throwing light on the matter..."

স্যার টমাস কার্লাইল ১৮৪০ সালের মে মাসে তার 'Heroes and Hero Worship' নামের বক্তৃতায় বলেনঃ

'মুহাম্মাদ (সা.) কাজে, কথায় এবং চিন্তায় ছিলেন সত্য। তিনি কখনো নিরর্থক কথা বলতেন না, বরং কখনো কখনো নিরবতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন তাঁর কথা হতো প্রাসঙ্গিক, প্রজ্ঞাময় আর অকপট এবং তিনি সর্বদা মূল বিষয়ে আলোকপাত করতেন...' তিনি আরও বলেন:

"A poor shepherd people roaming unnoticed in the deserts since the creation of the world; a hero Prophet was sent down to them with a word they could believe; see the unnoticed became world noticeable, within one century afterwards Arabia is at Granada on this end; at Delhi on that; glancing with valour and splendour and the light of genius."

'আরবরা ছিল দরিদ্র মেষপালক যারা সৃষ্টির শুরু থেকে মরুভূমিতে সকলের অলক্ষ্যে বিচরণ করে বেড়াত। এই আরবদের কাছে একজন মহামানবকে (মুহাম্মদ সাঃ) সত্য বাণী (আল-কুরআন) সহকারে পাঠানো হল, আর তারা সেই বাণী বিশ্বাস করলো। এই বিশ্বাসের ফলে তারা সমগ্র পৃথিবীর কাছে নির্ভীক আর প্রতিভার আলোয় জাজ্বল্যমান ঈর্ষণীয় এক জাতিতে পরিণত হল এবং মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল গ্রানাডা এবং দিল্লী পর্যন্ত।।"

3. Michael H. Hart said on the topic why Muhammad (pbuh) topped his list:

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most intellectual persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels."

(M. H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons on History, New York, 1978, p. 33)

মাইকেল এইচ. হার্ট বলেনঃ

'মুহাম্মাদকে (সা.) 'বিশ্বের সেরা বুদ্ধিদীপ্ত মানুষরা' এর তালিকায় সবার উপরে স্থান দেয়ার ব্যাপারটা অনেক পাঠককে হয়তো অবাক করবে

আবার কেউ কেউ হয়তো এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, কিন্তু সমগ্র ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় এবং সাংসারিক উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতার অধিকারী ।”

(এম. এইচ. হার্ট, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons on History, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩৩)

4. George Bernard Shaw said:

‘I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness.”

(The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, No. 8, 1936)

‘He established a powerful and dynamic society to practice and represent his teachings and completely revolutionized the worlds of human thought and behavior for all times to come”

(The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, No. 8)

নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন,

‘আমার বিশ্বাস যদি তাঁর মতো একজন মানুষ বর্তমান বিশ্ব পরিচালনা করতেন তবে আজকের সমস্যাগুলো দূর হয়ে যেতো এবং প্রয়োজনীয় শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হতো ।”

‘তিনি একটি শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ছিল তার শিক্ষার প্রতিফলন এবং এই সমাজ ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতার চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল ।”

(The Genuine Islam, সিঙ্গাপুর, ১৯৩৬, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮)

5. Mahatma Gandhi :

‘…I was more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self - effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in Allah and his own mission…"

(The statement was published in the ‘Young India” in 1924)

মহাত্মা গান্ধী বলেন,

‘...আমার বদ্ধমূল ধারণা যে, সেই সময়ে মানব জীবনে ইসলাম যে স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তার মূল কারণ তরবারি নয়, বরং তা ছিল ইসলামের শৈথিল্যবিহীন সরলতা, নবীর একাগ্র বিনয়, অজুহাতের বিপরীতে নৈতিক অবস্থান, বন্ধু আর অনুসারীদের প্রতি প্রবল মনোযোগ, তাঁর সাহসীকতা, নির্ভীকতা এবং আল্লাহ উপর ও স্বীয় দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা... ।”

(এই বক্তব্য ১৯২৪ সালে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)

6. Historian Alphonse de LaMartaine said:

"Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and one spiritual empire, that is MUHAMMAD. As regards all the standards by which Human Greatness may be measured, we may well ask, IS THERE ANY MAN GREATER THAN HE?"

(Lamartine Histoire De La Turquie, Paris, 1854, vol.2, page 276-277)

ফরাসী ইতিহাসবেত্তা আলফোস দ্য ল্যামারটেইন বলেছেন,

‘দার্শনিক, বক্তা, স্বর্গীয় বার্তাবাহক, আইন প্রয়োগকারী, যোদ্ধা, চিন্ত াধারার সংশোধনকারী, প্রতিমূর্তি বিহীন ও যুক্তিসম্মত ধর্ম মতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, বিশটি ভূ-সাম্রাজ্য আর তাওহীদের প্রতিষ্ঠাতাই হলেন মুহাম্মাদ(সাঃ) । মানবীয় গুণাবলী পরিমাপের সকল মাপকাঠি বিবেচনায় এনে এককথায় আমরা বলতে পারি, তাঁর থেকে উত্তম মানুষ কি আর কেউ আছে ?”

(Lamartine Histoire De La Turquie, প্যারিস, ১৮৫৪, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭)

7. Reverend Bosworth Smith told:

"He was Caesar and Pope in one; but he was Pope without Pope's pretensions, Caesar without the legions of Caesar: without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; if ever any man had the right to say that he ruled the

right divine, it was Mohammed, for he had all power without its instruments and without its supports."
(Bosworth Smith, Muhammad and Mohammedanism, London, 1874, page 92.)

রেভেরেন্ড বসওর্থ স্মিথ বলেনঃ

'তিনি ছিলেন একই সাথে একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্ম প্রচারক। তাঁর মাঝে কোনো দাম্ভিকতা ছিল না। তিনি এমন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তবে যার কোনো বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল না, ছিল না কোন দেহরক্ষী অথবা কোন প্রাসাদ কিংবা নির্দিষ্ট কোন রাজস্ব বিভাগ। যদি কেউ কখনো দাবি করতে পারে যে সে যথার্থ নিয়মে রাষ্ট্র শাসন করেছে, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে মুহাম্মাদ(সাঃ)। তিনি ছিলেন যাবতীয় দুনিয়াবী ভোগ বিলাস এবং উপকরণের অমুখাপেক্ষী।'

(Muhammad and Mohammedanism, লন্ডন, ১৮৭৪, পৃষ্ঠা ৯২)

8. American author, historian and biographer Washington Irving said:

'In his private dealings he was just. He treated friends and strangers, the rich and poor, the powerful and weak, with equity, and was beloved by the common people for the affability with which he received them, and listened to their complaints. His military triumphs awakened neither pride nor vain glory, as they would have done had they been effected for selfish purposes. In the time of his greatest power he maintained the same simplicity of manners and appearance as in the days of his adversity."
(Mahomet and his successors, 1850)

মার্কিন লেখক, ইতিহাসবিদ এবং জীবনীলেখক ওয়াশিংটন আরভিং লিখেছেনঃ

'আচার আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। পরিচিত কিংবা অপরিচিত, ধনী অথবা গরীব, ক্ষমতাবান বা দুর্বল সকলের সাথে তিনি একই আচরণ করতেন। তিনি সকলের সাথেই শিষ্টাচার বজায় রাখতেন এবং সকলের অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। এজন্য সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র। সামরিক বিজয়সমূহ তাঁর মাঝে কোন ধরনের অহংকার কিংবা দাম্ভিকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ, যেহেতু সামরিক অভিযান সমূহের পিছনে তাঁর

কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠেও তিনি ঠিক তেমন ই ছিলেন যেমনি তিনি প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন।"

(Mahomet and his successors, 1850)

9. MAJOR A. LEONARD told about Muhammad (pbuh):

'If ever any man on this earth has found God; if ever any man has devoted his life for the sake of God with a pure and holy zeal then, without doubt, and most certainly that man was the Holy Prophet of Arabia"

(Islam, its Moral and Spiritual Values, page 9; 1909, London)

মেজর এ. লিওনার্ড মুহাম্মাদ(সাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ

'যদি এই পৃথিবীর কোন মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করে থাকে; যদি কোন মানুষ পবিত্র চিত্ত নিয়ে সৃষ্টিকর্তার জন্য আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে সেই মানুষ হলেন আরবের নবী (সাঃ)।"

(Islam, its Moral and Spiritual Values , লন্ডন, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৯)

10. Diwan Chand Sharma wrote:

"Mohammad was the soul of kindness, and his influence was felt and never forgotten by those around him."

(D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 1935, page - 12)

দিওয়ান চান্দ শর্মা লিখেছেনঃ

'মুহাম্মাদ(সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান। এবং তিনি এত বেশি প্রভাবশালী ছিলেন যে তাঁর আশেপাশের মানুষ সব সময় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতেন।" (D. C. Sharma, The Prophets of the, কলকাতা, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৯)

11. John William Draper, M.D., L.L.D. wrote in his book:

'Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the greatest influence upon the human race... To be the religious head of many empires, to

guide the daily life of one-third of the human race, may justify the title of a Messenger of God."
(A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol.1, pp.329-330 (

জন উইলিয়াম ড্র্যাপার, এম. ডি., এল. এল. ডি. তার বইতে লিখেছেনঃ

'জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরবের মক্কায় একজন মানুষের জন্ম হয়, যিনি মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন... তাঁর জন্য বহু দেশের ধর্মীয় নেতা আর পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনের পথ প্রদর্শক হওয়া ই প্রমাণ করে যে তিনি হলেন ঈশ্বরের বার্তাবাহক ।"
(A History of the Intellectual Development of Europe, লন্ডন, ১৮৭৫, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০)

12. S. P. Scott writes in his history book:

'If the object of religion be the inculcation of morals, the diminution of evil, the promotion of human happiness, the expansion of the human intellect, if the performance of good works will avail in the great day when mankind shall be summoned to its final reckoning it is neither irreverent nor unreasonable to admit that Muhammad was indeed an Apostle of God."
(History of the Moorish Empire in Europe, p. 126)

এস. পি. স্কট তার ইতিহাস বইতে লিখেছেন ,

'যদি ধর্মের মূলমন্ত্র হয় নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা, মন্দ দূরীভূত করা, মানুষের সুখ আনয়ন করা, মানব বুদ্ধির সম্প্রসারণ করা, যদি মানুষের কৃত ভাল কাজগুলো থেকে যায় সেই দিন পর্যন্ত যেই দিন মানুষকে ডাকা হবে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ করার জন্য তবে এটা মেনে নেয়া কখনো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মুহাম্মাদ(সাঃ) প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ।"
(History of the Moorish Empire in Europe, পৃষ্ঠা ১২৬)

13. W. Montgomery Watt said about Muhammad (pbuh):

"His readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character of the men who believed in

him and looked up to him as leader, and the greatness of the ultimate achievement-all argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raised more problems than solves. Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad."
(W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford, 1953, p. 52.)
ডব্লিউ মন্টগমারি ওয়াট বলেনঃ
‘নিজের বিশ্বাসের জন্য তাঁর অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করার মানসিকতা, যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের সুউচ্চ নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর চূড়ান্ত অর্জনের ব্যাপকতা- এ সব কিছুই তাঁর মৌলিক ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ বহন করে। মুহাম্মাদকে (সাঃ) একজন প্রতারক সাব্যস্ত করলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। বস্তুত, পশ্চিমা দেশে ইতিহাসের মহান কোন মানুষকে এমন অবমূল্যায়ন করা হয়নি যেমন মুহাম্মাদকে (সাঃ) করা হয়েছে।”
(W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, অক্সফোর্ড, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৫২)

14. A quotation from Napoleon Bonaparte written in Christian Cherfils

"I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness."
(Napoleon Bonaparte as Quoted in Christian Cherfils, 'Bonaparte et Islam,' Pedone Ed., Paris, France, 1914, pages. 105, 125)
‘ক্রিশ্চিয়ান শেরফিলস” এ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছেঃ
‘আমি আশা করি সেই সময় বেশি দূরে নয় যখন আমি সকল দেশের সকল জ্ঞানী আর সুশিক্ষিত মানুষদের একত্র করতে সক্ষম হব। আর কোরআনের নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্হা স্থাপন করব। একমাত্র সত্য এই নীতিই কেবলমাত্র মানুষকে শান্তির পথ দেখাতে সক্ষম।”

(Bonaparte et Islam, পেডন সংস্করণ, প্যারিস, ফ্রান্স, ১৯১৪, পৃষ্ঠা ১০৫, ১২৫)

15. Annie Besant wrote admiring the Prophet Muhammad (pbuh):

"It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme. … I myself feel whenever I re-read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher."

(Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad, Madras, 1932, page 4)

অ্যানি বেসান্ট মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রশংসা করে বলেনঃ

'যদি কেউ সত্যিকার অর্থে আরবের মহান নবীর জীবনচরিত পড়ে থাকে, যদি কেউ জানতে পারে যে তিনি কীভাবে মানুষকে শিখিয়েছেন, কীভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন তবে পাঠক তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোন মনোভাব পোষণ করতে পারবে না। তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাবান নবী, মহামহিম ঈশ্বর প্রেরিত প্রধান বার্তাবাহকদের অন্যতম।... আমি যতবার তাঁর জীবনী পড়ি ততবার ই আমার মনে আরবের এই ক্ষমতাবান শিক্ষকের প্রতি নতুন বিস্ময়বোধ এবং গভীর ভক্তির সঞ্চার হয়।"

(Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad, মাদ্রাজ, ১৯৩২, পৃষ্ঠা ৪)

16. James A. Michener has told about Muhammad (pbuh):

"No great religious leader has been so maligned as Prophet Mohammed. Attacked in the past as a heretic, an impostor, or a sensualist, it is still possible to find him referred to as "the false prophet." A modern German writer accuses Prophet Mohammed of sensuality, surrounding himself with young women. This man was not married until he was twenty-five years of age, then he and his wife lived in

happiness and fidelity for twenty-four years, until her death when he was forty-nine. Only between the age of fifty and his death at sixty-two did Prophet Mohammed take other wives, only one of whom was a virgin, and most of them were taken for dynastic and political reasons.."

(James A. Michener, "Islam: The Misunderstood Religion," in ReaderÕs Digest (American edition), May 1955, pp. 68-70.)

জেমস এ. মিশনার মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে বলেন,

'কোন ধর্মীয় নেতাকে এত বেশি অপবাদ দেয়া হয়নি যতটা মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দেয়া হয়েছে। অতীতে তাঁকে বলা হত প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধাচরণকারী, একজন ভন্ড, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী। এমনকি আজকের দিনেও তাঁকে মিথ্যা নবী হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। একজন আধুনিক জার্মান লেখক তাঁকে 'প্রবৃত্তির অনুসারী' বলে দোষারোপ করেছে, বলেছে যে তিনি নাকি যুবতী নারী পরিবেষ্টিত থাকতেন। অথচ দেখুন এই মানুষটি ২৫ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন, এরপর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সুখ ও বিশ্বস্ততার সাথে চব্বিশ বছর দাম্পত্য জীবন পার করেছেন, তাঁর বয়স যখন ৪৯ তাঁর স্ত্রী মারা যান। কেবল ৫০ থেকে ৬২ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করেন যাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন ছিলেন কুমারী। আর বাকী বিবাহ সমূহের পিছনে কৌশলগত কিংবা রাজনৈতিক কারণ ছিল।"

(James A. Michener, "Islam: The Misunderstood Religion", রিডার্স ডাইজেস্টের আমেরিকান সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, মে ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ৬৮-৭০)

17. Walter C. Taylor said:

'So great was his liberality to the poor that he often left his household unprovided, nor did he content himself with relieving their wants, he entered into conversation with them, and expressed a warm sympathy for their sufferings. He was a firm friend and a faithful ally."

(The History of Mohammedanism and its Sects)

ওয়াল্টার সি. টেলর বলেছেন,

'তাঁর (মুহাম্মাদ সাঃ) উদারতা এত বেশি ছিল যে তিনি প্রায়ই নিজের ঘরের মানুষদের অভুক্ত রেখে গরীবদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। তিনি

শুধু তাদের প্রয়োজন পূরণই করতেন না, তাদের সাথে বাক্যালাপ করতেন, তাদের দুর্দশায় উষ্ণ সহানুভূতি জানাতেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত বন্ধু।"
(The History of Mohammedanism and its Sects)

18. Jules Masserman wrote in an article:
'Perhaps the greatest leader of all times was Mohammad, who combined all the three functions. To a lesser degree Moses did the same."
(Jules Masserman in 'Who Were HistoriesÕ Great Leaders?' in TIME Magazine, July 15, 1974)
জুলস মেসারম্যান একটি নিবন্ধে লিখেছেনঃ
'সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ(সাঃ) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যিনি তিন প্রকার কর্মকান্ডকে একত্র করেছেন। মোজেসও (মুসা আঃ) একই কাজ করেছিলেন, তবে কম।"
(জুলস মেসারম্যান এর নিবন্ধটি টাইম ম্যাগাজিনে ১৯৭৫ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হয় 'Who were Histories' Great Leaders?' শিরোনামে)

19. Dr. Gustav Weil wrote in his book 'History of Islamic people':
'Muhammad was a shining example to his people. His character was pure and stainless. His house, his dress, his food - they were characterized by a rare simplicity. So unpretentious was he that he would receive from his companions no special mark of reverence, nor would he would accept any service from his slave which he could do for himself. He was accessible to all and at all times. He visited the sick and was full of sympathy for all. Unlimited was his benevolence and generosity as also was his anxious care for the welfare of the community."
(Dr. Gustav Weil, 'Geschichte der Islamischen Völker von Mohammed bis zur Zeit des Sultans Selim', Stuttgart, Germany, 1866)

ড. গুস্তাভ ভীল তার ‘History of Islamic people’ বইতে লিখেছেনঃ

‘মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের কাছে ছিলেন এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর চরিত্র ছিল নির্ভেজাল, কলঙ্কমুক্ত। তাঁর ঘর, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ছিল বিরল সরলতায় মন্ডিত। তিনি এতটাই অনাড়ম্বর ছিলেন যে, না তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে ভক্তি স্বরূপ কিছু গ্রহণ করতেন আর না তিনি তাঁর দাস-দাসীদের কাছ থেকে কোন সেবা নিতেন। এসব তিনি চাইলে অনায়াসে পেয়ে যেতেন। তাঁর নিকট সর্বদা সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি অসুস্থদের কাছে যেতেন এবং সবার জন্য তিনি সমব্যথী ছিলেন। যেমন বিশাল ছিল তাঁর দয়া আর বদান্যতা, উম্মাহর কল্যাণার্থে তেমনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি।”

(জার্মান ভাষায় লিখিত বই ‘সুলতান সেলিমের সময় পর্যন্ত মহম্মদের ইসলামী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস”, স্টুটগার্ট, জার্মানি, ১৮৬৬)

‘বল, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ (তওবা ৯:২৪)

‘বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি’। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।’ (আল ইমরান, ৩:৬৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্তমান যুগের কিছু জ্ঞানপাপী নাস্তিক-মুর্তাদ ও ব্লগারদের ধৃষ্টতা

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা ব্লগকে একশ্রেণীর যুবক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন, মহানবী মুহাম্মদ (সা.), ঈদ, নামায, রোজা ও হজ সম্পর্কে জঘন্য ভাষায় বিষোদগার করে মুসলমানদের ঈমান-আকীদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল লেখা পড়লে যে কোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা। ব্লগে ইসলামী বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় এবং নবী-রাসুলদের কাল্পনিক কাহিনী ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায়। ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুক্রবার রাতে মিরপুরে খুন হওয়া শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহমেদ রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবা।

অবশ্য রাজীবের ব্লগে ইসলামবিরোধী লেখার লিঙ্কগুলো তার মৃত্যুর পর সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন আর ইন্টারনেটে ওইসব ধৃষ্ঠতাপূর্ণ লেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি প্রচেষ্টায় এরই মধ্যে তাকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য এসব লিঙ্ক খুঁজে খুঁজে মুছে (ডিলিট) দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, থাবা বাবার লেখা নিয়ে যারা সমালোচনা করেছে ফেসবুকসহ সেই লিঙ্কগুলোও এরই মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, দৈনিক ইনকিলাব 'ইসলামের মহানবীকে (সা.) অবমাননা করে ব্লগে রাজীবের কুরুচিপূর্ণ লেখা' শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপলে ইনকিলাবের ওয়েবসাইটের ওই লিঙ্কটিও ব্লক করে দেয়া হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তারা অনলাইনে ইনকিলাবের ওই সংবাদটি পড়তে পেরেছেন।

রাজীবকে অজ্ঞাত ঘাতকরা শুক্রবার রাতের অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার পর জবাই করে হত্যা করে। তাকে 'দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ' হিসেবে অভিহিত করে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নেয়া হয়েছে।

এদিকে থাবা বাবা হিসেবে ব্লগে ইসলামবিদ্বেষী লেখক রাজীবের মৃত্যুর পর ব্লগার কমিউনিটিতে চলছে তোলপাড়।

ইন্টারনেট থেকে রাজীবের আপত্তিকর লেখা সরিয়ে নেয়ার আগে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ব্লগার থাবা বাবা ওরফে রাজীব মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অনেক কুরুচিপূর্ণ লেখা ব্লগে লিখে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। বামপন্থী ও রামপন্থী

কিছু ব্লগার এরই মধ্যে ব্লগে অভিযোগ করেছেন, ব্লগার থাবা বাবা ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দারের নিজস্ব ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগ nuranichapa.wordpress.com ভুয়া। তবে এই ব্লগটা এখন আর নেই কেন এ প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। এই সাইটে ক্লিক করলে লেখা আসছে- nuranichapa.wordpress.com is no longer available
জানা গেছে, এই থাবা বাবা হলো www.dhormockery.net নামক ব্লগের নিয়মিত লেখক। এই সাইটটিও এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। তবে বর্তমানে এটি পুণরায় খুলা হয়েছে। অবশ্য যে কেউ এর cache copy দেখতে পারেন google.com এ। গুগল এ গিয়ে cache:www.dhormockery.com টাইপ করে enter চাপলেই লেখা আসছে- This is Google's cache of http://www.dhormockery.com/. It is a snapshot of the page as it appeared on 16 Feb 2013 17:40:37 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more....
অর্থাৎ গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারিতেই এই সাইটটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যেখানে এখন আর কোনো তথ্য নেই।
দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করে আসা ব্লগাররা 'থাবা বাবা ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দারকে ভার্চুয়াল ব্লগে বিচরণ করতে দেখেছেন বলে লিখছেন। প্রথম আলো পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেও লেখা হয়েছে, ব্লগার থাবা বাবা ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দার www.amarblog.com এ নিয়মিত লিখতেন। এখানে সে ৩ বছর ১৩ সপ্তাহ ধরে লিখছে যা ব্লগে তার প্রোফাইল অপশন থেকে জানা গেছে। আমার ব্লগের এই লিংক- http://www.amarblog.com/thaba/posts/150478 এ (গত ১৫ই জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল) গেলেও প্রমাণ মিলবে এই ব্লগার থাবা বাবা ওরফে আহমেদ রাজীব হায়দার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছেন।
রাজীব 'নুরানী চাপা' নামের একটি ব্লগে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। সেখানে 'মোহাম্মকের (মোহাম্মদ+আহাম্মক) সফেদ লুঙ্গি, ঈদ মোবারক আর ঈদের জামাতের হিস্টরি, ঢিলা ও কুলুখ, সিজদা, হেরা গুহা, ইফতারি ও খুর্মা খেজুর, সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত, লাড়াইয়া দে, মদ ও মোহাম্মক, আজল' ইত্যাদি শিরোনামে বেশ কিছু বিতর্কিত ব্লগ লিখেছে।
ফেসবুকেও ইসলামকে কটাক্ষ করে রাজীবের কিছু মন্তব্য : সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০০৭

সালের ১১ নভেম্বর Ahmed Rajib Haider ফেসবুক এ জয়েন করে। তার ফেসবুক আইডি-
https://www.facebook.com/rha.rajib
২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে সে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, ১০ হাজার মানুষ হত্যার প্রামাণ্য অভিযোগ মাথায় নিয়ে ১১ সেপ্টেম্বর হত্যাবার্ষিকীতে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব পালন কতটা মানবিক?' (সম্ভবত এদিন মুসলমানদের ঈদের দিন ছিল)। (তারমতে ঐ দিন ঈদ পালন করা উচিৎ হয় নাই। (নাউযুবিল্লাহ)
গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে লিখেছে, 'সবাই তারেক-কোকো আর হাসিনা-খালেদার বিদেশে টাকা পাচারের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় করে ফেলছে... এদিকে প্রতি বছর সবার চোখের সামনে দিয়ে কয়েক লাখ হাজী যে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা সৌদি আরবে ঢেলে দিয়ে আসছে সেটা কেউ টু শব্দটা করে না...!!' (তার মতে হজ্জ করা অন্যায় কাজ-নাউযুবিল্লাহ)
২০১১ সালে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে সে মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ করে লিখেছে, 'মুসলিমদের 'টেররিস্ট' আখ্যা দেয়া অন্যায়, তাদের জন্য উপযুক্ত নাম হলো 'সিরিয়াল কিলার'!"
আবার ২৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, আমরা ঈশ্বর নামক কারও জারজ না... আমাদের বাবা-মায়েরা নিজেদের দৈহিক মিলনের মাধ্যমে আমাদের জন্ম দিয়েছে! আমার স্রষ্টা আমার জেনেটিক বাবা-মা, আমি তাদের সৃষ্টি। আবার আমি আমার সন্তানদের স্রষ্টা...তারা আমার সৃষ্টি!!! আর এই পুরো প্রকৃয়াটিতে বাবা-মায়ের বাইরে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সে হলো ধাত্রী অথবা ডাক্তার ও নার্স! (এখানে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে বহু সৃষ্টিকর্তা তৈরী করেছে। এমনকি সে নিজেও একজন সৃষ্টিকর্তা)।
বিভিন্ন ব্লগে নিহত ব্লগার থাবা বাবার এরকম কয়েকটি লেখা যা হুবহু পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো :

ঈদ মোবারক ও ঈদের জামাত নিয়ে তার ধৃষ্টতাপূর্ণ ও মনগড়া কাহিনী: (দৈনিক আমার দেশ ও ইনকিলাব পত্রিকা হতে সংগৃহিত)
ঈদ মোবারক আর ঈদের জামাতের হিস্টরি : খাদিজার হাতে ধরা খাইয়া মোহাম্মকের টানা একমাস খানা খাইদ্য সাথে দাসী বান্দী পুরাই অফ আছিল (সিয়াম সাধনার ইতিবৃত দ্রষ্টব্য) তার জেলখানার মেয়াদ শেষ হইতে না হইতেই এক দৌড়ে বাইর হইয়া সরাসরি পাবে জমজমে (আবে জমজম কে ব্যঙ্গ করে) চইলা গেল। এতো দিনের না খাওয়া বান্দা তাই বেসামাল আরবি (মদ- নাউযুবিল্লাহ) টানলো হাউশ ফুরাইয়া। তার পর তার সেই চিরাচরিত কাবাঘরের সামনের চত্বরে সাথে তার ইউজুয়াল

ইয়ার-দোস্তরা। মোহাম্মক তো টাল স্বপ্নে উম্মেহানীর গুহায় ডুবসাঁতার কাটতে ডাইভ দিছে, আর তার পুরা একমাস 'মোহাম্মক-মধু' বঞ্চিত দোস্তরা তাদের কঠিন ঈমান লইয়া মধুর ভাণ্ডের ওপর ঝাপায় পড়লো। সবাই আরবি খাওয়া ছিল, তাই টাল সামলাইতে না পাইরা কেউ কেউ মোহাম্মক মনে কইরা অন্যদের মধুও খাওয়া শুরু করলো। যথারীতি সকাল বেলা মোহাম্মক উর্ধ্বপোঁদে মধুদ্বার চেগায়া পইড়া থাকলো জ্বালাপোড়া ঠেকাইতে, আর তার পিছে তার ইয়ার দোস্তরা। কারণ টাল হইয়া কে যে কার মধু খাইয়া ফালাইছে তার হিসেব আছিল না, তাই সবারই পশ্চাদ্দেশ ব্যথা (নাউযুবিল্লাহ)। এই দিকে খাদিজা বিবি শিবলি থুক্কু সুবেসাদিকে তার মুবারক নামক ভৃত্যের কাছে খবর পাইলো তার পাতিনবী পতিদেব কাবা ঘরের সামনে আরবি খাইয়া ইয়ারদোস্ত লইয়া পুন্দাপুন্দি করতাছে। কোনোরকমে তুপটা গায়ে জড়ায়া মুবারকরে লইয়া দিল দৌড়। তার যা মেজাজ তখন, হাতের কাছে থান ইট পাইলে মোহাম্মকের মস্তক শরীফ আস্তা থাকার কথা না। খাদিজা দৌড়াইতাছে, সামনে মুবারক দৌড়াইতাছে আর খাদিজা চিল্লায় চিল্লায় কইতাছে 'মুবারক ইট, মুবারক ইট', মানে মুবারকরে ইট নিতে কইতাছে মোহাম্মকের মাথা থ্যাতলানের জইন্য। কিন্তু তখনো তো পোড়া ইট আরবে ঢোকে নাই, তাই মুবারকও ইট খুঁইজা পায় নাই। এই দিকে চিল্লাপাল্লা আর খাদিজার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেইখা মানুষজনও তাদের পিছে পিছে যাওয়া শুরু করলো মজমা দেখতে। কিন্তু কাহিনী তো তারা জানে না, তারা শুধু শুনছে খাদিজা চিল্লাচ্ছে 'ইট মুবারক, ইট মুবারক'!!! কাবা প্রাঙ্গণে গিয়া দেখে মোহাম্মক আর তার পিছে সবাই লাইন ধইরা উর্ধ্বপোঁদে পজিশিত। মক্কাবাসীরে মোহাম্মক আগেই বুঝায় রাখছে যে ঐটা হৈল নামাজের সিজদা (সিজদা দ্রষ্টব) তাই তারা আসল কাহিনী ধরতে না পাইরা মনে করল ইটের দিন জামাতে সিজদা দেওন লাগে আর চিল্লায় চিল্লায় ইট মুবারক কওন লাগে! সেই থেকে একমাস না খায়া থাইকা পরের দিন উর্ধ্বপোঁদে নামাজ পরা আর ইট মুবারক বলার রীতি শুরু হইল, আর কালক্রমে শব্দবিচ্যুতির কারণে ইট হয়ে গেল ঈদ! (নাউযুবিল্লাহ! কি জঘণ্য মিথ্যা কাহিনী রচনা করলো রাসূলের শানে)

ঢিলা ও কুলুখ নিয়ে বেয়াদবী:

ঢিলা ও কুলুখ

'বাবা মোহাম্মক তোমাকে যুদ্ধে যাইতে হইপে।"

'কেনু কাক্কু?'

'যুদ্ধে না যাইলে যে আমাগের না খাইয়ে মরিতে হইপে বাবা!'

'আচ্ছা তবে যাইব। কিন্তুক আমাকে কোথায় খাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হইপে? সামনে খাড়ায় নাকি পিছনে?'

'মনে করো সামনেই খাড়াইতে হইপে'
আমারে কি উষ্ট্রী দেয়া হইপে নাকি খাড়ার ওপরে পলাইতে হইপে? উষ্ট্রী দিলে কোন কথা নাই, কিন্তু খাড়ার ওপরে পলাইতে হইলে দুইখান কথা আছে।'
'তোমাকে খাড়ার ওপরই পলাইতে হইপে।'
'আমি যদি পলাইয়া মক্কা চলিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে কুনু কতা নাই, কিন্তু কাফেররা ধরিয়া ফেলিলে দুইখান কতা আছে।'
'মনু করো তাহারা তোমাকে ধরিয়া ফেলাইপে'
'কাফের রমণীরা আমাকে তাহাদের গনিমতের মাল বলিয়া ব্যাবহার করিপে নাকি আমার কল্লা কাটিয়া ফেলাইপে।'
'কল্লাই কাটিল না হয়, তুমার যা সাইজ ইউজ কেউ করিপে না'!
'আমাকে কাটিয়া শকুন দিয়া খাওয়াইপে নাকি কব্বর দিপে!'
'তাকে কব্বরেই পাঠাবে রে বাবা!'
'আমার কবর কি মরূদ্যানে দেবে নাকি মরুতে? মরুতে দিলে কতা নাই, কিন্তু মরূদ্যানে দিলে দুইখান কতা আছে!'
'দরকার হইলে আমি তুমাকে মরুখে তুলে নিয়ে মরূদ্যানে লইয়া আসিপ!'
'কাক্কু কব্বরে কি খাইজুর গাছ লাগাইপে নাকি বাবলা বেরেক্ষ?'
'বাবলা বেররেক্ষ হইপে বাবা!'
'সেই বাবলা গাছে কি জ্বালানি কাষ্ঠ হইপে নাকি কাগজ?'
'কাগজই হইপে'
'কি কাগজ কাক্কু? লিখিপার জইন্য বেদাতী কাগজ নাকি টিস্যু'
'টিস্যুই না হয় হইপে!'
'সুরত মুছিপার টিস্যু কাক্কু, নাকি এস্তেঞ্জা করিপার?'
প্রশ্নবানে জর্জরিত কাক্কু আপদুল্লা বুঝিয়াছে বাস্তে মোহাআম্মক ভাগার তাল করিতেছে, তাই ক্ষেপেছে বে, 'এস্তেঞ্জা করিপারই হইপে তোর মতো চুরাকে কি কেউ মাথায় করিয়া রাখিপে?'
'তাহা হইলে কাক্কু সে টিস্যু কি পুরুষে ব্যবহার করিপে নাকি নারীতে?'
'তুই কি তছলিমা নাসরীন যে নারী পুরুষে ভেদাভেদ করিয়া দিলি?'
তরুণ মোহাম্মক তাহার প্রশ্নবাণ শেষ করিবার আগেই কাক্কু তাহাকে চাক্কু দেখাইয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলো। কেই বা এমন প্যাচাল শুনিতে চায়! মোহাম্মকের সম্যক প্রশ্ন সত্বেও তাহাকে যুদ্ধে যাইতে হইলো জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহার যুদ্ধে মরিয়া নারীকূলের ব্যবহার্য টিস্যু হইবার ভয়ে কাটিয়াছে। তাই শেষ পর্যন্ত টিস্যু, মায় জলগ্রহণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ঢিলাকুলুখ ও পাথুর ব্যবহারের রীতি প্রদান করিয়া তবে শান্তি পাইলো! সেই থেকে লিকুইড এস্তেঞ্জার পরে ঢিলাকুলুখ (এক্ষেত্রে নারীকূলের কথা ভাবা হয় নাই) ও সলিড এস্তেঞ্জার পরে ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ ইত্যাদি

সংখ্যক পাথর ব্যবহার মুসলমানদিগের জন্য ফরজ হইয়া গেল। (মিথ্যাবাদী মুরতাদের কত বড় বেয়াদবী)

সিজদা নিয়ে মারাত্মক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যঃ

মোহাম্মক তাহার ইয়ার দোস্ত লইয়া প্রায়শই কাবা প্রাঙ্গণে আরবি খাইয়া (মদ বিশেষ) পড়িয়া থাকিত। মোহাম্মদ যখন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিত, তখন তাহার ইয়ার দোস্তরা এই গোল্ডেন অপরচুনিটি মিস করিবে কেন? সবার তো আর উম্মেহানী নেই।

ইয়ার-দোস্তদিগের গোল্ডেন অপরচুনিটির শিকার হইয়া সুবে-সাদিকের সময় ঘুম ভাঙ্গিলে রেকটাম-প্রদাহের ঠ্যালায় মোহাম্মকের পক্ষে চিত-কাইত হইয়া শয়ন করা বাস্তবিক অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতো। তাই পশ্চাদ্দেশের আরামের নিমিত্তে সে ঊর্ধ্বপোঁদে রেকটামের স্ফিংকস্টার পেশি চেগাইয়া পড়িয়া থাকিত। এমতাবস্থায় কেউ দেখিয়া ফেলিলে চাপা মারিত যে, সালাত আদায় করিতেছে আর এই ভঙ্গিটির নাম সিজদা।

সেই হইতে মুসলমানের জন্য ঊর্ধ্বপোঁদে সিজদার প্রচলন শুরু হইয়াছে! (নাউযুবিল্লাহ! সিজদাহ নিয়ে কত বড় মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী)

ইফতারি ও খুর্মা খেজুর নিয়ে জঘন্য তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যঃ

একদা মোহাম্মক তাহার ৩০০ মিলিওন বছরের পুরান পাবলিকা মডেলের গাধায় চড়িয়া দাফতরিক কাজে মক্কার উপকণ্ঠে বনি লুবর-ই-কান গোত্রের মরূদ্যানের দিকে যাইতেছিল। তাহার মেজাজ যাহারপরনাই খারাপ। যাতায়াতের নিমিত্তে খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড মডেলের লিমোজিন উষ্ট্রীটিকে সে পায় নাই। খাদিজা তাহাকে পতিত্ব দান করিয়া শরীরের অধিকার দান করিলেও দাফতরিক কার্যে কেরানি অবধিও পদোন্নতি দান করে নাই। মক্কার সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যবসায়ীর পতি নবী হইলেও তাহাকে অদ্যাবধি সশরীরে মরুভূমিতে দুম্বা চড়াইতে যাইতে হয়। পদোন্নতি ঘটিবে এমন সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। ইকরা পাস করিলে পদোন্নতি ঘটার কথা, জেব্রাইলের উত্তম-মধ্যম খাইয়া ইকরা পাসও করিয়াছিল, কিন্তু খাদিজার 'ইমতিহান'এ ফেল মারিয়া থোড় বড়ি খাড়াতেই রহিয়া গিয়াছে, খদিজা বিবি তাহার পদোন্নতি আটকাইয়া দিয়াছে।

আজকের ট্রিপটিতে মোহাম্মক নিজে না গিয়া সাকরেদ আবু বকরীকে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু খাদিজা তাহার হস্তে 'কনফিডেনশিয়াল' কণ্টকখচিত খেজুরপত্রের আঁটি ধরাইয়া সব মাটি করিয়াছে। তাহার হেরা গুহায় গিয়া নাসিকায় উষ্ট্র চর্বির তৈল ঘষিয়া দিবানিদ্রার দ্বাদশ ঘটিকা বাজাইয়া দিয়াছে। তথাপি অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে বাহির হইতে হইলো। বাহির হইবার মুখে একবার মনস্থ করিল খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চন্দ্রাতপ আঁটা উষ্ট্রীখানিকে যাতায়াতের নিমিত্তে লইয়া

যাইবে, কিন্তু তাহার কিছু বলিবার আগেই খাদিজা বিবি তাহার হস্তে বসিবার গদিবিহীন পাবলিকা গাধার রজ্জু ধরাইয়া দিল। বনি লুব-ই-কান গোত্রের মরূদ্যানে যাইতে যাইতে এসব কথা ভাবিয়া খাদিজা বিবির চতুর্দশ গুষ্টির পিণ্ডি উদ্ধার করিতেছিল সে। কনফিডেনশিয়াল না ঘেচু। উষ্ট্রের গায়ে মর্দন করিবার উত্তম তৈলের একচেটিয়া কারবার বনি লুবর-ই-কান গোত্রের। সুদূর মেসোপটেমিয়া হইতে আমদানি করা বিশেষ কাস্ত ারি ব্র্যান্ডের তৈল না হইলে খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড লিমোজিন মডেলের উষ্ট্রীর গাত্র কুটকুট করে। তাই ঐ তৈল না হইলে হয় না। কিন্তু এবারের চালানে মক্কার কেন্দ্রীয় চুঙ্গীঘরকে গোপন করিয়া বেশ কিছু মিশরীয় উষ্ট্রী আসিয়াছে। তাই মক্কার মুসক বিভাগ তাহার পিছে পড়িয়া গিয়াছে উপযুক্ত মুসক আদায়ের লক্ষ্যে। কনফিডেনশিয়াল খেজুর পত্রে বনি লুবর-ই-কান গোত্রাধিপতিকে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে, কয় অ্যাম্ফোরা তৈল খাদিজা বিবি ক্রয় করিয়াছে তাহা যেন কুরাইশ মুসক বিভাগের অ্যাম্ফোরা গণকদিগের এনকোয়ারিতে গোপন রাখা হয়, নইলে তাহারা অ্যাম্ফোরা গুনিয়া উষ্ট্রীর মুসক হিসাব করিয়া ফেলিবে।

মোহাম্মক বনি লুবর-ই-কান গোত্রের মরূদ্যানের নিকটবর্তী হইতেই দেখিল গোত্রাধিপতির তাম্বুর সম্মুখে মুসক বিভাগের চারিখানা উষ্ট্র দণ্ডায়মান। অ্যাম্ফোরা গণকেরা মোহাম্মকের পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় গাত্র ঢাকা দেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই। খাদিজার খেজুর পত্র তাহাদের হাতে পড়িলে সমূহ বিপদ। কাকা আবু তালিব বিন আবদুল মুত্তালিবও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবে না। মোহাম্মক গাধা ঘুরাইয়া আবার মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলো, কিন্তু ততক্ষণে মুসক বিভাগের গণকেরা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে মোহাম্মকও বেশ দূরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পাবলিকা গণকদিগের রেসিং উষ্ট্রের সহিত পারিবে কেন? তাই মোহাম্মক গাধা ঘুরাইয়া নিকটবর্তী পাথরের স্তূপের দিকে ধাবিত হইল। সেই স্থানে পৌঁছাইয়া মোহাম্মক তাড়াতাড়ি তাহার পাবলিকা গাধাটিকে একটি বৃহত্ প্রস্তরের আড়ালে লুকাইয়া নিজে একটি গুহায় গিয়া আত্মগোপন করিল। গণক বাহিনী চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া মক্ষা (মক্কাকে তুচ্ছ করে) প্রত্যাবর্তন করিবে। কিয়ত্কাল পরে গণকেরা চলিয়া গেলে মোহাম্মক ধীরে ধীরে গুহা হইতে বাহির হইয়া বোকা গর্ধবটিকে লইয়া মক্কার পথে রওয়ানা হইল। একে তো কার্য সমাধা হয় নাই, তাহার ওপর পাবলিকা গর্ধবের পৃষ্ঠে কোনোরূপ গদি নাই। তাহার পশ্চাদ্দেশে গাধার মেরুদণ্ডের ভার্টিব্রা যেন খেজুর বিচির ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। গর্ধবের চেনা পথ, তাহাকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন নাই বিধায় মোহাম্মক গাধার পৃষ্ঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মক্কার মূল পথে উঠিবার ঠিক পূর্বে একটি ক্ষুদ্র মরূদ্যান পার হইবার সময় হঠাত্ করিয়া একটি খেজুর ঝোপের আড়াল হইতে চারিখানা উষ্ট্র আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মোহাম্মক চমকিয়া উঠিল, সেই অ্যাস্ফোরা গণকের দল। তাহারা মোহাম্মককে তাহার তুপ (আরবীয় আলখাল্লা) ধরিয়া নামাইয়া মরূদ্যানের অভ্যন্তরে খেজুর পত্রের তৈরি একখানি নড়বড়ে কুটিরে লইয়া গেল। তাহার পর তাহাকে ভূমিতে ভূলুণ্ঠিত করিয়া খেজুর পত্রের রজ্জু দ্বারা উত্তম রূপে গ্রন্থিত করিয়া জেরা শুরু করিল, খাদিজা বিবি কয়খানা মিশরীয় উষ্ট্রী ইম্পোর্ট করিয়াছে। মোহাম্মকও বলিবে না, অ্যাস্ফোরা গণকেরাও ছাড়িবে না। প্রহর দেড়েক কাটিয়া যাইবার পরেও তাহারাদিগের প্রধান মোহাম্মকের নিকট হইতে কোনো বাক্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে অধস্তন একটি সাকরেদকে নির্দেশ প্রদান করিল যে বাহিরে সবচাইতে বড় যেই ফল পাইবে, তাহাই যেন সত্বর লইয়া আসে। অধস্তন গণনাকারী কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাঁদি হরিদ্রা রঞ্জিত বৃহত্ খেজুর লইয়া হাজির হইল। মোহাম্মকের খেজুর দেখিয়াই ক্ষুধা চাগাইয়া উঠিল। যেই সে এই কথা বলিতে যাইবে, অধিপতি বলিল, 'তুই আবু তালিব বিন মুত্তালিবের ভাতিজা বলিয়া আজ ছাড়িয়া দিতাছি, তথাপি পরবর্তীতে যেন কোনরূপ মুসক দানে অপারগতা প্রকাশ না করিস, তাই কিঞ্চিত্ আগাম সতর্কবার্তা দিয়া ছাড়িয়া দিতাছি।' তাহার পর চার ষণ্ডা মিলিয়া আল্লার পেয়ারা নবীকে উপুড় করিয়া তুপ তুলিয়া একটা একটা খেজুর ভড়িতে শুরু করিল। মোহাম্মক খেজুর গ্রহণের তীব্র বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার পর সে অনুধাবন করিল যে, সে আসলে তাহার পাবলিকার পৃষ্ঠে তন্দ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে, আর তাহার পৃষ্ঠের ভার্টিব্রা তাহার পশ্চাদ্দেশে শক্ত খেজুরের ন্যায় খোঁচা মারিয়া যাইতেছে অনবরত।

তন্দ্রা ভাঙিয়া দুঃস্বপ্ন উপলব্ধি করিবার পরপরই সে দেখিল, সে গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তড়িঘড়ি করিয়া পাবলিকা হইতে অবতরণ করিয়া অসার পশ্চাদ্দেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিল, তাহার নসিবখানা নিতান্তই প্রসন্ন যে, সে আরব ভূমিতে জন্মিয়াছে। নচেত্ বাঙ্গালদেশের কাঁঠাল, দাক্ষিণাত্যের নারকেল বা নিদেনপক্ষে পারস্যের আখরোট গ্রহণ করতঃ তাহার রেকটামের দ্বাদশ ঘটিকা বাজিয়া যাইত। তাই সে আরব ভূমিতে জন্মগ্রহণের নিমিত্তে আল্লাকে শুক্রাণু থুড়ি শুক্রিয়া আদায় করিয়া মুচকি মুচকি হাসিয়া ফেলিল। ঠিক এই সময় আবু-বকরী (আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সবথেকে প্রিয় এবং কাছের ছিলেন তাকে তুচ্ছ করিয়া) একঝুড়ি হরিদ্রা রঞ্জিত বৃহত্ খেজুর লইয়া খাদিজা বিবির গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, উপরন্তু মোহাম্মককে আল্লার কাছে শুক্রিয়া আদায় অবস্থায় আবিষ্কার করিল। মোহাম্মকের শুক্রিয়া আদায় সমাপ্ত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে রাসুলে

খোদা, এই শুক্রিয়া আদায়ের নিমিত্ত সম্পর্কে কি আমি জ্ঞাত হইতে পারি?' রাসুলে খোদা তাহার দিকে ফিরিয়া হস্তের ঝুড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, 'ইয়া আবু বকরী, তুমি নিশ্চয়ই আল্লার শুক্রিয়া আদায় করো, কারণ তুমি জান না আল্লা তোমাদিগের জন্য রমজানের ইফতারিতে কি তিনখানা বস্তু নেয়ামত স্বরূপ পাঠাইয়াছে।'
বকরি সুধাইলো, 'কি সেই তিনখানা বস্তু খোদাবন্দ?'
মোহাম্মক রিপ্লাই করিল, 'তাহার প্রথমটি হইলো খেজুর কাঁঠাল নয়, বল আলহামদুলিল্লা।'
বকরি বলিল, 'আলহামদুলিল্লা'
'দ্বিতীয়টি হইলো খেজুর নারিকেল নয়, বলো আলহামদুলিল্লা।'
বকরি বলিল, 'আলহামদুলিল্লা।'
তৃতীয়টি হলো খেজুর আখরোট নয়, বলো, 'আলহামদুলিল্লা।'
বকরি বলিল, 'আলহামদুলিল্লা।'
এই বলিয়া মোহাম্মক আবু বকরীর নিকট হইতে খেজুরপূর্ণ ঝুড়িখানা হস্তগত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত হইলো আর বকরী আল্লা ও তার রাসুলের গুণে মুগ্ধ হইয়া এই আশ্চর্য সুসংবাদ তামাম জাহানের মুসলমানদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বাহির হইয়া পড়িল! (নাউযুবিল্লাহ! কত বড় ধৃষ্টতা)

সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত

সে অনেক কাল আগের কথা। আরবের লোকেরা তখন আল্লাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ভোলে নাই কেবল একজন, মহামতি মোহাম্মক। তাহাও খোদাতালা তাহাকে জেব্রাইল প্রেরণ করিয়া উত্তম মধ্যম সহযোগে ইয়াদ করাইয়া না দিলে তাহারও আল্লার কথা ইয়াদ করিতে বেগ পাইতে হইতো। তা সেইবার জেব্রাইলের মধ্যম উত্তমরূপে খাইয়া তাহার ভয়ানকরূপে বাহিরে বালিয়াড়ির আড়ালে যাইবার বেগ চাপিয়াছিল কিনা আমাদিগের নিশ্চিত জানা নাই, তবে তাহার বৃদ্ধা পত্নী খাদিজা হইতে বর্ণিত যে, সেবার পর্বত-পাদদেশ হইতে ভেড়া লইয়া ফিরিবার পর সবরী থুক্কু পেয়ারা নবী বেশ কিছু দিবস শয্যাশায়ী ছিলেন। যাহা হউক, তাহার বেশ কিছুদিন গত হইবার পর আজিকার এই কাহিনীর আরম্ভ।
হেরা গুহায় জেব্রাইলের উত্তম মধ্যম খাইয়া মোহাম্মদের আল্লার কথা মনে পড়িয়াছিল বটে। আধুনিক বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের মাথায় ডান্ডার বাড়ি খাইয়া ইয়াদ্দাশ ফেরত আসিবার গল্প বোধ করি ১৪০০ বৎসর পূর্বের মোহাম্মকের উত্তম মধ্যম খাইবার ঘটনা হইতেই আসিয়াছে। তবে স্মৃতি ফিরাইবার ক্ষেত্রে উত্তম মধ্যম যে কীরূপ কার্যকর তাহা মোহাম্মকের ঘটনা হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই স্মৃতি এমনই বলশালী হইয়া ফেরত আসিয়াছিল যে মোহাম্মক তাহার বাকি জীবন আল্লার শবরী কলা

হিসাবেই কাটাইয়া দিবার নিমিত্তে নিজেকে উত্সর্গ করিয়া দিয়াছিল। তবে তাহার আল্লার দূত হইবার সমস্ত আয়োজনই এক কথায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইতে বসিয়াছিল তাহার পত্নী খাদিজার উপস্থিতিতে। খাদিজা তাহার পতি-নবীকে হস্তে রাখিবার নিমিত্তে তাহার সমস্ত কথাই বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইয়াছিল ঠিকই, তথাপি তাহার কথায় কদাচিত্ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। আর মোহাম্মক যেইরূপ প্রায়শই তাহার ব্যবসায়িক তহবিল তছরুপ করিত, তাহাতে তাহার আল্লার সাক্ষ্যও খুব একটা কার্যকরী হইতে পারিছেলিন না। অপর হস্তে খাদিজা প্রেমময় পত্নী হইলেও বিষয়বুদ্ধিতে ছিলেন খুব কড়া। পতিনবী মোহাম্মককে পরমাত্মীয় বলিয়া ক্ষমা করিবার পাত্রী খদিজা ছিলেন না। তাই প্রতিবারই সে তহবিল হোক চাই কি ভেড়ার পাল, তছরুপের দায়ে মোহাম্মককে শাস্তি পাইতে হইতো। তা সে পিঠে হালকা পাদুকা বৃষ্টি নতুবা পানাহার রহিতকরণ। (নাউযুবিল্লাহ)

সেইরূপ একদা মোহাম্মক পত্নী খাদিজার অনুমতি ব্যতিরেকে আস্ত একপাল উট আল্লার পথে উত্সর্গ করিয়া বসিয়াছিল, যদিও তাহার কোন চাক্ষুস প্রমাণ উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হওয়ায় খাদিজা তাহাকে শাস্তিস্বরূপ এক চন্দ্রকাল দিবাভাগের পানাহার রহিত করিয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিল। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত তাহার নিকট পানাহার প্রেরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দাসীদিগের ওপরেও মোহাম্মকের নিকট না যাইতে কড়া হুকুম জারি করিয়া দিয়াছিলেন। তাই খাবার ও দাসী উভয় হইতেই মোহাম্মক বঞ্চিত হইতেছিল। দিবাভাগ ব্যতীত পানাহার ও দাসীর সমব্যভিহারে কোন নিষেধাজ্ঞা খাদিজার নির্দেশনামায় না থাকিলেও খাদিজা মহাম্মকের কর্মকাণ্ডের প্রতি কঠিন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে মোহাম্মক বেজায় বেকায়দায় পড়িয়াছিল।। খাদ্যে তাহার সেন্সরশিপের সহিত খাদিজাকে গোপন করিয়া কচিত্-কদাচিত্ দাসী নতুবা বগ্নি উম্ম-হানীর সাহচর্য লাভের সুযোগও রহিত হইয়া বসিল।

এমতাবস্থায় শিশ্নের ক্ষুধা চাপিয়া রাখিতে পারিলেও আরবস্থলির ক্ষুধা নিবারণ ক্রমশ কঠিন হইয়া যাইতেছিল। সূর্যাস্তের পরে ও নিদ্রাপূর্বক আহার ব্যতীত অন্যরূপ আহারের অভাবে মোহাম্মক উদরে প্রস্থরবন্ধনী লইতে বাধ্য হইয়াছিল। তথাপী তাহার ক্ষুধা নিবারণে অন্যরূপ সমস্ত উপায়ও খাদিজা রহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি খাদিজার হেঁসেল হইতে চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

কিন্তু কথায় যেরূপ বলিয়া থাকে যে মোহাম্মকের বিংশ রজনী ও খাদিজার এক, সেরূপ শাস্তির বিংশত রজনী দ্বিপ্রহরে মোহাম্মক খাদিজার হস্তে রঞ্জিত হস্তে ধরা পড়িয়া গেল। তাহাতে লোক জানাজানিও কম হইলো

না। ঘৃহের অভ্যন্তরে কোনরূপ মান-সম্ভ্রম কোনকালেই মোহাম্মকের ছিল না, কিন্তু মক্কা নগরীর জনগণের নিকট আল্লার একমাত্র সেবকরূপে তাহার বিশেষ পরিচিতি বজায় ছিল। তাহার ওপর মোহাম্মকের গোপন কারোবার হিসেবে একখানা অর্থের বিনিময়ে আমানত-গাহ বিশেষ খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও তাহার গুডউইল হিসাবে তাহার কপালে আলামিন খেতাবও জুটিয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় চৌর্যবৃত্তির সহিত তাহার সংস্রব প্রমাণিত হইলে তাহার যত্সামান্য এক্সটা ইনকামও রহিত হইয়া কদাচিত্ খাদিজার আরালে ইয়ার দোস্ত লইয়া আমোদ স্ফুর্তি করিবার পথও রহিত হইয়া যাইবে। তাই তাহার আমানতগাহ এবং আলামিন উপাধি রক্ষার্থে তাহাকে সর্বসমক্ষে একখানা চাপা উপস্থিত করিতে হইলো, তাহা হইলো ঐ একচন্দ্র সময়কাল যাহাকে স্থানীয় ভাষায় রমজানুল চন্দ্র বলা হইতো আল্লাহ তাহাকে সিয়াম সাধনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর এই সিয়াম সাধনার তরিকা হইলো রাত্রি দ্বিপ্রহরে আহার্য সাধন করিতে হইবে, তাহার পর সূর্যাস্তের পরে আবার আহার্য গ্রহণের অনুমতি মিলিবে। এই সময়ের মধ্যে কোনরূপ পানাহার ও নারীগমন নিষিদ্ধ। সেই হইতে মোহাম্মকের চৌর্যবৃত্তি ঢাকিতে প্রদত্ত চাপা অনুসরণে মোহাম্মকের বিশাল উম্মক-বাহিনী অদ্যবধি রমজানুল চন্দ্রে সেইরূপ পানাহার ও নারীগমনে বিরত থাকে এবং সূর্যাস্তের পরে ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এই বিধানকেই আমরা পবিত্র সিয়াম সাধনা বলিয়া মানিয়া থাকি।

অন্যদিকে চৌর্যবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ তাহার খাদ্য রহিতকরণের বিংশ দিবসের পর হতে অবশিষ্ট চন্দ্রদিবস সমূহতে খাদিজা মোহাম্মককে কক্ষে অন্তরীণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যা অদ্যাবধি আমরা ইতিকাফ বলিয়া পালন করিয়া থাকি। (নাউযুবিল্লাহ)

ব্লগার রাজীব ওরফে থাবা বাবার আরও অনেক পোস্ট রয়েছে যেগুলো খুবই অশ্লীল বলে ছাপা গেল না।

রাজীবের পাশাপাশি আরও যেসব ব্লগার শাহবাগের আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখি চালিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ডা. ইমরান এইচ সরকার, অমি রহমান পিয়াল, আরিফ জেবতিক, নিজেকে নাস্তিক দাবিকারী আসিফ মহিউদ্দিন, কট্টর আওয়ামীপন্থী ব্লগার ইব্রাহিম খলিল (সবাক) প্রমুখ। এছাড়া ইংল্যান্ড প্রবাসী আওয়ামীপন্থী এক ব্লগার আরিফুর রহমানকে দেখা যায় নানা আপত্তিকর মন্তব্য করতে। তাদের মধ্যে আসিফ মহিউদ্দিন সামনের সারিতে থেকে শাহবাগের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আসিফ মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নিজেকে নাস্তিক দাবি করলেও তার যত মাথাব্যথা ইসলাম ধর্ম নিয়ে। তবে কখনও কখনও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে অন্য একটি ধর্মেরও সমালোচনা করে থাকে সে। একটি বিশেষ ধর্মের সে অনুসারী হলেও

মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামকে বিতর্কিত করতে এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেও সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে গুজব রয়েছে।
নিচে শাহবাগ আন্দোলনে সক্রিয় কয়েকজন আওয়ামীপন্থী ও নাস্তিক ব্লগারের কটাক্ষপূর্ণ এরকম কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

কোরআনের আয়াত ও ইসলাম নিয়ে আসিফ মহিউদ্দিনের কটাক্ষ :
আসিফ মহিউদ্দিন একজন স্বঘোষিত নাস্তিক। সে কমিউনিজমে বিশ্বাসী। শাহবাগে প্রথম সমাবেশে সে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ওইদিন তাকে পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এ ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।
আসিফ মহিউদ্দিন (গত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১ রাত ১১:০০) ব্লগে একটি পোস্ট লেখে। সেখানে ইসলাম ও কোরআনকে কটাক্ষ করে তার লেখা হলো : 'বিসমিল্লহির রহমানির রাহিম। আউজুবিল্লা হিমিনাশ শাইতানির নাস্তিকানির নাজিম।'
গত বছরের ৫ মে পবিত্র কোরআন শরিফকে মহাপবিত্র 'আহাম্মকোপিডিয়া' লেখার মতোও ধৃষ্টতা দেখায় এ ব্লগার। তবে পরে তীব্র প্রতিবাদের মুখে এ পোস্টটি সে তার ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলে (এর স্ক্রিন শট এখনও আছে)।
আসিফ মহিউদ্দিন তার ফেসবুক ওয়ালে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ (স.) নিয়ে লেখে, 'মুহাম্মদ নিজেকে আইডল বা নিজেকেই ঈশ্বর না বলে একটি কল্পিত ঈশ্বরকে উপস্থাপন করেছেন। মানুষ যেন ব্যক্তিপূজায় আসক্ত না হয়, তাকেই যেন মানুষ ঈশ্বর বানিয়ে পূজা করতে শুরু না করে, সে ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন। তাই তার সমস্ত রচনাই তিনি আল্লার নামে চালিয়ে দিয়েছেন, এর রচয়িতা হিসেবে আল্লাকে সৃষ্টি করেছেন!' আরেক লেখায় সে লিখেছে, 'ধর্মান্ধ মুসলিমদের উত্তেজনার শেষ নেই। তাদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কে মুহাম্মদের ছবি আঁকলো, কে ধর্মের সমালোচনা করলো। অথচ এতে মুহাম্মদ/আল্লার কখনই কিছু যাবে আসবে না। ব্যাপারটা এমন নয় যে, মুহাম্মদের ছবি আঁকা হলে স্বর্গে মুহাম্মদ সাহেব কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে আত্মহত্যা করছেন! আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, তার উম্মতরা ঠিকই তাকে একজন পীরে পরিণত করেছে।' ফেসবুকে বিশ্বনবীর একটি কাল্পনিক ছবিকে দেখিয়ে সে লেখে, এই ছবিটা মুহাম্মদের উন্মাদ উম্মতদের উদ্দেশ্যে একটা জবাব হতে পারে।'
ইসলামের বিধান পর্দা বা বোরকা নিয়ে সে লিখেছে, 'বোরখা পরাটা সমর্থন করি না, বোরখা হিজাব মূলত আরবির বর্বর সমাজের প্রতীক। একটা সমাজে অত্যধিক বোরখার প্রাদুর্ভাব থাকা মানে হচ্ছে সেই সমাজের পুরুষগুলো সব এক একটা ধর্ষক, সেই ধর্ষকদের হাত থেকে

বাঁচার জন্য সকল নারীকে একটা জেলখানা নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এইসব অজুহাতে নারীকে যুগ যুগ ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কখনও ঘরের ভেতরে, আবার কখনও বোরখা নামক চলমান জেলখানার ভেতরে।'

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দান নিয়েও কটাক্ষ করে সে লিখেছে, 'ধার্মিকদের মাথায় স্বার্থচিন্তা থাকে যে, এই উপকারে সে পরকালে হুর পাবে। এমনকি তারা কোন দরিদ্র, দুস্থ, পঙ্গু মানুষকে দেখলেও বেশিরভাগ সময়ই স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভাবে। আর যদি ওই পঙ্গু লোকটির কথা ভাবেও, তাতেও তাদের মাথায় থাকে স্বর্গে হুরী সঙ্গমের অশ্লীল চিন্তা।' তার মতে, 'জনগণের সুখ ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য সর্বপ্রথম যা করতে হবে, তা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উচ্ছেদ।'

তবে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এমন অবমাননামূলক ও উসকানিমূলক পোস্ট দিলেও আসিফ মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আরিফুর রহমান (হুঙ্কারসহ নানা নামে লেখে) লেখে, 'আমি মনে করি আল্লা বিষয়টা মুহাম্মদের একটা বুজরুকি। ছিটগ্রস্ত মুহাম্মদ তার হ্যালুসিনেশনের সময় মনে করতো জিব্রাইল আইছে, তাই আল্লার কাল্পনিক কাহিনী বানিয়ে ধর্ম তৈরি করেছে। নাম দিয়েছে ইজলাম। এই হলো আল্লা বিষয়ে আসল কাহিনী।' হিজাব নিয়ে আরিফ লিখেছে, 'হিজাব হলো ছৌদি নোংরামির চূড়ান্ত... কুত্তাদের কালো কাপড়ের কালচার। একে বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়াটাই একটা বড় রকমের গুনাহ...!! হিজাবের বিরুদ্ধে পোস্টতো আসবই। ইসলামী পুরুষতন্ত্রের ছাগুরা।'

ইব্রাহিম খলিল (সবাক) : ইব্রাহিম খলিল নামের এক প্রতারক সবাক নামে লিখেছে, 'মির্জা সাথীর প্রোফাইট পিকচার সুন্দর। নিজের অজান্তেই লুল ফালাইতে ইচ্ছা কর্তাছে...'

আলআওয়াম আল আনায়াম (আওয়ামী লীগ চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়)। সুরা গো.আ, আয়াত-৪২০।

ধর্ম নিয়ে সবাক লিখেছে, 'শুয়রের বাচ্চারা বানাইছে একখান বালের ধর্ম। বৌ... (এতটা অশ্লীল শব্দ যে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না) কিছু কথা কইছে, আর... ফালানোর পর কিছু কথা বলে। দুইটাই শালাগো ধর্তব্য হইছে। বিশ্বাস হালকা কইরা স্বার্থবন্দী কথাগুলান যাচাই কইরা আবার ধার্মিকরাই বাহির কইরলো বিরাট ক্যারফা। তারপর ধর্মের গোয়া বাইর হইছে লস্করই-তাইয়্যিবাল, বাল কায়েদা, বালকাতুল জিহাদ, সোগাবুত হাহরীর। ধর্মরেও... ধর্মের সোগা দিয়া পয়দা হওয়া বর্বরগুলানরেও... ।'

শুধু তাই নয়, শাহবাগের আন্দোলনকারীদের অনেকের ফেসবুকে ইসলামকে নিয়ে নানা কটূক্তিকর স্ট্যাটাস বেশ দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমনি আশরাফুল ইসলাম রাতুল নামে এক আন্দোলনকারী কিছুদিন আগে

ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছে, 'সাহস থাকলে একবার শাহাবাগ আয় রাজাকারের চুদারা, তোদের মুহাম্মদ (স.) আর নিজামী বাপকে একে অন্যের পোদের ভেতর ঢুকাবো।' (নাউজুবিল্লাহ্)
এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে রীতিমত তোলপাড় চলছে। উসকানিমূলক ও চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ ও ইসলাম ধর্মের নানা দিক নিয়ে যথাসাধ্য পোস্ট দিচ্ছেন ইসলামপন্থী ব্লগাররা। তারা নাস্তিকদের দেয়া নানা যুক্তিও খণ্ডনের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোতে ফেসবুক ব্যবহারকারী ও ব্লগারদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য তাদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য জোড়াল আহ্বান করছে এবং জনমত সৃষ্টি করছে। আমরা এই কিতাবে উপরোক্ত নাস্তিকদের বক্তব্যগুলো যথেষ্ট কুরুচিপূর্ণ এবং অশোভন হওয়া সত্ত্বেও লিপিবদ্ধ করেছি। যাতে তাদের চরিত্র এবং নোংরামি সাধারণ মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

'আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে ছিলাম। তিনি ওমর (রা.) এর হাত ধরে ছিলেন। ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আমার প্রাণ ব্যতিত অন্য সব কিছু থেকে বেশী ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না! ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণ থেকে বেশী প্রিয় না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। ওমর (রা.) বললেন, এখন আপনি আমার প্রাণ থেকেও আমার নিকটে বেশী প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে ওমর! এখন তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হলে।' (বুখারী ৬৬৩২)

‘আর তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না।’ (আল ইমরান ৩:১০৩)

‘আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (আনফাল ৮:৪৬)

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে কটুক্তিকারীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান

১. তারা কাফের ও মুরতাদ

যারা রাসুল (সা.)কে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের হয়ে যায়। যদিও তারা সালাত, সাওম ইত্যাদি আদায় করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

-

-

মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বল, 'তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো। (সুরা তাওবা, ৯:৬৪-৬৬)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের ঈমানের পরে কাফের হয়ে গেছো। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

: :

( )

:

:

:

) » : ( )) :

আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কোন এক মজলিশে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বললো, আমাদের এই আলেমদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটপূজারী (লোভী), এতটা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ মজলিশের একজন ব্যক্তি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি একটা মুনাফেক। আমি অবশ্যই, তোমার এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং

এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাজিল হয়ে গেল। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমি দেখেছি ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উটের রশি ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো এইগুলো শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলনাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে উপহাস করছো? (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, আইসারুত তাফাসীর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

এ হাদীসেও দেখা গেল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তি করেছিল তারা কোনো ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ছিল না বরং নামধারী মুনাফেক মুসলমান ছিল। যারা শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতো না বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন।

২. তাদের হত্যা করতে হবে

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে জানা গেল যে, যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা আল্লাহর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা আর মুসলিম থাকে না বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। আর ইসলাম ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলামকে) পরিবর্তণ করলো তাকে তোমরা হত্যা কর। (বুখারী ৩০১৭; ৬৯২২; তিরমিজি ১৪৫৮; আবু দাউদ ৪৩৫৩; নাসায়ী ৪০৭০)

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে মুরতাদদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। শুধু তাই না রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই এই নির্দেশ বাস্তবায়ও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. ইবনে খাতাল

ইবনে খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি করে। যার পুরো আলোচনা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

‘আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল তার নিজস্ব দুটি গায়িকা নারীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কুৎসা মূলক গান গাওয়াতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন অন্যান্য কাফেরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কটাক্ষকারী ইবনে খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই অপরাধে অপরাধী যেমন তার ঐ দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, মাকিস ইবনে সুবাবা আল লাইসি গংদের ক্ষমা করা হয়নি। তাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। বরং তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটি বাঁদী ব্যতীত যে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পায়। (আল মাতালিবুল আলিয়া ৪২৯৯, ইত্তিহাফুল খিয়ারাহ ২/৪৬১৩, বুগইয়াতুল বাহিস ৬৯৮)
ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিষয়টি বলা হলো যে, ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ঐ অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র মাথায় যে হেলমেট পরা ছিল তা খুললেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল (বাঁচার জন্য) কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, (ঐ অবস্থায়ই) তাকে হত্যা করো। (বুখারী ১৮৪৬; মুসলিম ৩৩৭৪; তিরমিজি ১৬৯৩; আবু দাউদ ২৬৮৭; নাসায়ী ২৮৬৭)

খ. আবু রাফে’
ইউসুফ ইবনে মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে আমীর বানিয়ে তার

নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহূদী আবু রাফে’র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

....

আবু রাফে’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে)। আবদুল্লাহ (ইবনে আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করত: তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞাসা করলাম, আবু রাফে এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত

করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। এরপর তিনি বলেন–

অতঃপর আমি তরবারীর ধারাল অংশটি তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিত রূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি। (বুখারী ৪০৩৯; সুনানে বায়হাকী ১৮৫৬৫), জামেউল উসুল ফী আহাদিসির রসুল (৬০৬০), দালায়েলে নবুয়্যাহ (১২৫)

গ. কাব ইবনে আশরাফ

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কুৎসা রটনা করার জন্য যাদের হত্যা করা হয় তাদের মধ্যে আরেক জন হলো কাব ইবনে আশরাফ। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন–

কাব ইবনে আশরাফের জন্য কে আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়ালেন, এবং বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি

চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কাব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদাকা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কাব ইবনে আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমরা তো তাকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। কাব ইবনে আশরাফ বলল, ধার তো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি কি জিনিস বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীরদেরকে বন্ধক রাখব আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদের বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) তাকে পনুরায় আসার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কাব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে (তাদের কাছে যাচ্ছি)। কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কাব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলা, (অপরিচিত কোনো লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (রাবী বলেন) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমর কি তাদের দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ

করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে (কাব ইবনে আশরাফ) আসবে। তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুকতে থাকবো। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুকাব। কাব চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। কাব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, এরপর তিনি তার মাথা শুকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন,

আমাকে (আরেকবার শুকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, এবারে তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন। (বুখারী ৪০৩৮; মুসলিম ৪৭৬৫)

ঘ. জনৈক অন্ধ সাহাবী কর্তৃক নিজ দাসীকে হত্যা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রুপ করার কারণে একজন সাহাবী তার নিজ দাসীকেও হত্যা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) জেনে খুশি হয়েছেন ও উক্ত মহিলার রক্তকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। বিস্ত ারিত বিবরণ নিম্নের হাদীস থেকে জেনে নিন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

-

- - -

- -

- -

.« »

-            -

-            -   .

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তির একটি উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) দাসী ছিল। ঐ দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অযথা কটুক্তি করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন ও নিবৃত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না। এক রাতে দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি ও গালী-গালাজ করতে লাগলো। তখন লোকটি একটি কোদাল দিয়ে তার পেটে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যা করলো। এ অবস্থায় তার একটি সন্তান তার দুপায়ের মাঝখানে পরে গেল এবং রক্তে ভিজে গেল। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিষয়টি জানানো হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের জড়ো করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে সে যেন অবশ্যই দাঁড়ায়। তার প্রতি আমারও একটি হক রয়েছে। তখন অন্ধ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে মানুষের কাঁতার ভেদ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে বসে পড়লোা। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘটনার ব্যক্তিটি আমি। আমার দাসীটি আপনাকে গালী-গালাজ করতো এবং অযথা তর্কে লিপ্ত হতো। আমি তাকে বারণ করলেও সে বারণ হতো না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দুটি ছেলে রয়েছে। তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গতরাতে সে যখন আপনাকে গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কুঠার নিয়ে তার পেটে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা সাক্ষি থাক! তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হলো (তাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না)।' (আবু দাউদ ৪৩৬৩, ত্ববারানী ১১৯৮৪, বুলুগুল মারাম ১২০৪, দারাকুতনী ৮৯) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি করে তাদের রক্তের কোনো মূল্য নেই। তাদের যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেখানে সে অবস্থায় হত্যা করলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো বিচারের সম্মুখিন হতে হবে না।

৬. আবু আফাক নামন জনৈক ইয়াহুদির হত্যা।

বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি যার নাম ছিল আবু আফ্ক। তার বয়স ছিল ১২০ বছর। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে

মদীনায় গেলেন, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য লোকদের উসকানী দিতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন তখন তার হিংসা বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরূদ্ধে সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। সালেম ইবনে উমায়ের নামক সাহাবী বলেন–

.

: .

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, হয়তো আমি তাকে হত্যা করবো নয়তো আমি নিজে তাকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হবো। এরপর সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন, কোন এক গরমের মৌসূমে চাঁদনী রাতে লোকটি বারান্দায় খোলামেলা জায়গায় ঘুমালো। তখন সালেম ইবনে উমায়ের তরবারী দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং তার কলিজা পর্যন্ত কেটে ফেললেন। লোকটি গড়াগড়ি করতে লাগলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। লোকেরা তাকে ঘরে নিয়ে গেল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ায় তাকে কবরস্থ করলো। লোকেরা বলতে লাগলো, তাকে কে হত্যা করেছে জানতে পারলে আমরা তাকেও হত্যা করতাম (কিন্তু তাদের সে আশা অপূর্ণই রয়ে গেল)।' (আস সারেমুল মাসলূল ১/১১০; তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ ২/৩৮; আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ২/৪৪৫, কিতাবুল মাগাযী লি ওয়াকিদী ১/১৭৫)

চ. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অবমাননাকারী কবিদের হত্যা করার নির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের পরে কতিপয় কবিদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গাল মন্দ ও তুচ্ছ-তিচ্ছিল্য করে কবিতা আবৃত্তি করতো। তাদের বেশীরভাগ লোকদেরকে হত্যা করা হয়। কিছু লোক পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে।

এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মক্কার কবিদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিতো বা তার সমালোচনা করতো তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- ইবনে যিবা'রী গংদের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। তার অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে−

তার অপরাধ ছিলো, শুধুমাত্র এটাই যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে চরমভাবে শত্রুতা পোষণ করতো। সে ছিলো একজন বড় মাপের কবি। সে রাসূল (সা.) এর সমালোচনার সাথে সাথে মুসলিম কবি- হাস্‌সান বিন সাবেত, কাব ইবনে মালেকদের বিরূদ্ধেও সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। এ কারণেই তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। নতুবা অন্যান্য অপরাধে তার মতো আরো অনেকেই ছিলো কিন্তু তাদের ব্যাপারে হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়নি। (আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪২; তাবকাতে ইবনে সাআদ ১/২৫৯)
পরবর্তীতে ইবনে যিবা'রী ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর কাছে আগমন করা সত্বেও তাকে ক্ষমা করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে−

অতঃপর ইবনে যিবা'রী নাজরান এলাকায় পালিয়ে গেল। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করে এবং নিজের তাওবা ও ওজর পেশ করে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠ করে তা স্বত্তেও তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ সেদিন মক্কার সকল অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কেবলমাত্র সে এবং তার মতো যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সমালোচনার অপরাধে অপরাধী ছিল তারা ব্যতিত। (আস সারেমূল মাসলূল (১/১৪৩১)

ছ. আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে হত্যার সুযোগ দেওয়া।
মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফের-মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। যদিও তারা বেলাল (রা.) কে উত্তপ্ত বালুর উপরে চিৎ করে শুয়ে রেখে উপরে পাথর চাপা দিয়ে চরম নির্যাতন করেছে। আম্মার ইবনে ইয়াসির ও তার পরিবারকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে।

সুমাইয়া (রা.) কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে হত্যা করেছে। এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে ফেলেছিলো। সেইসব চরম শত্রুদের ক্ষমা করলেও যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তচ্ছিল্য করেছে এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছে তাদের ক্ষমা করা হয়নি। এরকমই এক ব্যক্তির নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ।
যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

.

-

- -

-

.

সাইদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতিত সকলকে নিরাপত্তা দান করেন (এরা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করেছিলো)। তাদের মধ্যে একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। সে ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) এর নিকট আত্মগোপন করে। ওসমান (রা.) তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে হাজির করালেন আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর থেকে (ইসলামের) বায়আত নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাথা উঠালেন এবং তার প্রতি তিন বার তাকালেন। তিনবারই তার বাইয়াত নেওয়াকে অবজ্ঞা করছিলেন। তারপর বাইয়াত নিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলনা, যে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হবে? যখন আমাকে দেখলো যে, আমি তার বাইয়াত নেওয়া থেকে আমার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। লোকেরা বললো, আমরাতো বুঝতে পারিনি যে আপনার মনে কি রয়েছে। আপনি একটু চোখ দিয়ে ইশারা করলেই তো হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন নবীর জন্য চোখের খেয়ানত করা উচিত না।' (আবু দাউদ ২৬৮৫)

জ. হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাক্বিস ইবনে সুবাবাহ হত্যা ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সত্ত্বেও কতিপয় পুরুষ ও নারীদের হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন। এমনকি তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন

:

যদি তাদের কাবার গিলাফের নিচেও পাও তবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে। তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। তারা হলো : আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবী সারাহ, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাক্বিস ইবনে সুবাবাহ ও বনু তামীম ইবনে গালেব গোত্রের একজন। এদের মধ্যে হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়যকে আলী (রা.) হত্যা করেন। (আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা কিংবা গালি-গালাজ করা অথবা কটুক্তি করার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড সে ব্যপারে কোনো আলেমদের দ্বিমত নেই। সকল মাযহাব ও সকল ফিরকার আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন ফিক্হী মাসয়ালা-মাসায়েলে দ্বিমত থাকলেও এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতের ওলামা ও ফুকাহাদের মতামত পেশ করা হলো।

৩। আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটুক্তিকারীর ব্যাপারে বিভিন্ন বিভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের বক্তব্য:

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল বাহরুর রায়েক শরহু কানজুদ দাকায়েক' কিতাবে বলা হয়েছে–

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে অবশ্যই মুরতাদ। ইসলামী শরিয়তে মুরতাদের যে বিধান তার ব্যাপারে সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে। মুরতাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তার ব্যাপারে সেই আচরণই করা হবে।'

.

রাসূল (সা.) কে গালী-গালাজকারী মুরতাদ। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে যারা এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন– তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, কাজী ইয়াজ। তিনি তার 'আল শেফা' নামক কিতাবে বলেন, আবু বকর ইবনুল মুনযির বলেছেন, অধিকাংশ আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে বা যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে তাকে বা তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ মত যারা পোষণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালেক ইবনে আনাস, লাইস, আহমদ, ইসহাক এবং এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব।'

'কাজী আবুল ফজল বলেন, এটাই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বক্তব্যের মর্মকথা। তিনি বলেছেন, এ ধরণের লোকদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। একই ধরণের মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তার মতের অনুসারীরা ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হেয় প্রতিপন্ন করলো অথবা গালী-গালাজ করলো অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। (আল বাহরুর রায়েক ১৩/৪৯৬; অধ্যায় : মুরতাদদের বিধি বিধান)

ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে

হানাফী মাযহাবের আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছে–

( ) :

:

'যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করবে তাদের হত্যা করার ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত। ইমাম মালেক, লাইস,

আহমদ, ইসহাক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তার সাথীবর্গ এবং ইমাম আওযায়ী সকলেই একমত পোষণ করেন...।' (ফাতওয়ায়ে শামী ৪/৪১৭)

কাজী ইয়াজের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের প্রসদ্ধি আলেম কাজী ইয়াজ (রহ.) বলেন–

'উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেওয়া বা তাকে অসম্মান করার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সকলের ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দিবে বা তার অসম্মান করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।' (আস সারিমুল মাসলূল ১/৯)

শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্যঃ

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন–

'যে ব্যক্তি সরাসরী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজীব এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত।' (কিতাবুল ইজমা ইমাম ইবনে মুনযির ১/৩৫)

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল ফারসী বলেন–

'শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল ফারেসী তার 'আল ইজমা' নামক কিতাবে বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন কোনো গালী দেয় যাতে অপবাদের বিষয় রয়েছে সে স্পষ্ট কুফুরি করলো। সে তওবা করা সত্ত্বেও তার হত্যার বিধান রহিত হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি হলো হত্যা যা তওবা করা সত্ত্বেও রহিত হয় না' (আল মাজমূ' লিন নাবাবী ১৯/৩২৬)

বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্লগাররা যাদের বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের ব্যাপারে যা লিখেছে বিশেষ করে সিজদা সম্পর্কে যে কাল্পনিক কাহিনী তৈরী করেছে তাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরূদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেওয়া

হয়েছে। তাই তাদেরকে কোনো ক্রমেই ক্ষমা করা যাবে না। তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ইমাম খাত্তাবী বলেন–

:

‘ইমাম খাত্তাবী বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করে তাদের হত্যা করা ওয়াজীব। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।’ (আস সারেমুল মাসলূল ১/৯)

মালেকী মাযহাবের বক্তব্য:
আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক কিতাবের বক্তব্য:

‘কোনো মুসলমান যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কোনো কাফের ঐ একই অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে দুটি মতামত রয়েছে। একটি হলো: সে ইসলাম কবুল করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি ধরা পড়ার পূর্বেই নিজে সেচ্ছায় ধরা দেয় এবং তওবা করে। আরেকটি হলো: না! তাকেও ক্ষমা করা হবে না বরং হত্যা করা হবে।’ (আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক ২/৫০৭)

আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ কিতাবের বক্তব্য:

‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে মুসলমান হোক বা জিম্মি (কাফের) হোক তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। এ দুটি মতই ইমাম মালেক (র.) থেকে ইবনুল হাকাম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।’ (আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ। অধ্যায় : মুরতাদদের প্রকাশ্য বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়ে)

আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী কিতাবের বক্তব্য:

‘যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূলকে অথবা অন্যকোনো নবী-রাসূলকে গালী দেয় তাকে ইসলামের নির্ধারীত বিধান অনুযায়ী হত্যা

করা হবে। সে যদি তওবা করে তা সত্ত্বেও তার এই শাস্তি রহিত হবে না।' (আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী ১১/৩০২)

হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য:
হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইমাম ইবনে কুদামা বলেন :

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেয় তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে।' (আশ শারহুল কাবীর লি ইবনি কুদামাহ ১০/৬৩৫)

আস সারেমুল মাসলূল নামক কিতাবে ইমাম আহমদ এর বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

:

'ইমাম আহমদ (র.) একাধিক জায়গায় বলেছেন, যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে তারা মুসলমান হোক বা কাফের হোক তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আমি মনে করি তাদেরকে তওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হোক।' (আস সারেমুল মাসলূল আ'লা শাতিমির রাসূল ১/১০)

উসূলুস সুন্নাহ কিতাবের বক্তব্য:

- - :

.

'সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এই যে, জিন্দীক মুনাফেক এবং যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অথবা সাহাবীদের গালী দেয় অথবা আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করে এবং যারা জাদুকর এবং যাদের মুরতাদ হওয়া বারংবার প্রমাণিত এদের সকলের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো, কোনো প্রকার তওবা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই তাদের হত্যা করতে হবে। যাতে তাদের অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অন্যেরা এ ধরণের অন্যায় করতে সাহস না পায়।' (উসলূস সুন্নাহ ১/৪৯২)

শায়খ বিন বায ও ইমাম আলবানীর বক্তব্য:

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসীরুদ্দীন আলবানী হাকীকাতুল ঈমান নামক কিতাবে বলেন,

..... -

:

*)

'শায়খ বিন বায বলেছেন, মানুষ কখনো মুখে অস্বীকার না করেও বিভিন্ন কারণে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যায়, যার বিস্তারিত বিবরণ আলেমগণ নিজ নিজ কিতাবের 'মুরতাদের বিধান' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলামকে নিয়ে অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করা অথবা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, বল! তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো (তাওবা ৯:৬৫-৬৬)।' (হাকীকাতুল ঈমান আশ শায়খ আলবানী ১/৩২)

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ কিতাবের বক্তব্য:

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ নামক কিতাবে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.) এর বর্ণিত 'ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

:

'যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে নিয়ে অথবা সাওয়াবের বিষয় নিয়ে অথবা শাস্তির বিষয় নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করে সে কাফের হয়ে যায়। দলীল পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো।' (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ২/২৬৬)

কুরআন হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমানীত হলো যারা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করে, কৌতুক করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করে, ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বীমত নেই।

....

'আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম ঢাল । তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই প্রতিরক্ষা হবে ।' (বুখারী হাঃ ২৭৫৭ ইমামের নেতৃত্বে অধ্যায়; মুসলিম হাঃ ১৮৩৫; নাসাই হাঃ৪১৯৩; ইবনে আবি শাইবা হাঃ ৩২৫২৯; আহমাদ হাঃ ৭৪২৮; ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯ ।)

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের করণীয়

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যারা আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অথবা কটুক্তি ও গালা-গালি করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আল্লাহর জমিনে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকে না। তাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই ইজমা রয়েছে। কিন্তু এদেশের মুসলিম জাতি তাদের পাওনা শাস্তি না দিয়ে তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন। আর তাতে নাস্তিক-মুরতাদরাই সুবিধা পাচ্ছে। সরকার তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। সাধারণ নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের নেতা খুজে পাচ্ছে। আর দেশি-বিদেশি প্রভুরা তাদের সাহায্য-সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ এ ধরণের কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যখনই এরকম কোনো বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই একদল লোক মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা-বিবৃতি শুরু করে দেয় এবং তাদেরকে হিরো বানায়। সরকার তাদের নিরাপত্তা দেয়। বিদেশিরা তাদের আশ্রয় দেয়। তাসলিমা নাসরিন, সালমান রূশদীরা এর জ্বলন্ত প্রমান। তবে এদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার পরে অন্যদেরকে সাবধান করার জন্য এধরণের কর্মসূচী পালন করা যেতে পারে। কিন্ত তা না করে শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কেউ যদি এদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়ীত করা। তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করে দেওয়া। তাদেরকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং তাদের আশ্রয় দেয়া, সাহায্য-সহযোগীতা করা ঈমানী দায়িত্ব।

যুগে যুগে এ ধরণের লোকদের হত্যা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এদের হত্যা করতে বলেছেন। যা বিস্তারিত ভাবে দলীল প্রমান সহ উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এ লোকগুলো ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় গণতন্ত্রের মুখোশ পরিধাণ করার কারণে জিহাদকে ভূলে গেছে। এখন তারা জিহাদ বলতে মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা-বিবৃতিকেই বুঝে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, জিহাদ কি জিনিষ? তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন- জিহাদ হলো আল্লাহর দুশমনদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হয়েছে:

.....

'আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়।' (জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭)

যে রোগের যে ঔষধ

অপারেশনের রোগীকে মলম বা এন্টিবায়েটিক দিলে চলে না। বরং তার একমাত্র চিকিৎসা হলো অপারেশন করা। নতুবা উক্ত ক্যান্সারযুক্ত অংশটি অন্য অংশকেও নষ্ট করে ফেলবে। ঠিক তেমনিভাবে নাস্তিক মুরতাদদের ব্যাপারেও শুধু মিছিল-মিটিং, বক্তৃতা-বিবৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত নাস্তিক-মুরতাদ কবি-সাহিত্যিক ব্লগারদের যথাযথ পাওনা মৃত্যুদন্ডই হচ্ছে চূড়ান্ত শাস্তি। এদের পাওনা শাস্তি চুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। মুমিনদের কাজ হলো আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। আর কাফেরদের কাজ হলো ত্বাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।' (নিসা ৪:৭৬)

এই ব্লগারচক্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের গভীর নিলনকশা বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এরা আইম্মাতুল কুফর। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।' (সুরা তাওবা, ৯:১২)

আজকে যারা পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে যেতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনাদের প্রতি এখন আর বিদেশ যেয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। বরং আপনাদের প্রতি ফরজ হলো আপনার

নিকটবর্তী নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

‘হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।’ (সুরা তাওবা, ৯:১২৩)

আল্লাহ (সুব.) যেমন কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন তেমনিভাবে বর্তমান যুগের ব্লগার মার্কা মুনাফিকদের বিরূদ্ধেও যুদ্ধ করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

.

‘হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।’ (তাওবা ৯:৭৩)
আজ যারা এই নাস্তিক-মুরতাদ ও ইয়াহুদী-খৃস্টানদের দালাল ব্লগারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তাদের উপরে চরম যুলুম ও নির্যাতন করা হচ্ছে। চতুর্দিকে মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। এই মজলুম উম্মাহর পাশে দাড়ানোর জন্য আল্লাহ (সুব.) আহ্বান জানাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

‘আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’ (সুরা নিসা, ৪:৭৫)

উদাত্ত আহ্বান

তাই আসুন আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের বিরুদ্ধে শীশা ঢালা লৌহ প্রাচীরের ন্যায় কাতার বন্দী হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন–

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।' (সুরা সফ, ৬১:৪)

গণতান্ত্রিক উপায়ে যারা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সমাধান করতে চান তাদের প্রতি আহ্বান

আপনারা যারা এদেশের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম নাস্তিক-মুরতাদদের খুশি করার জন্য বহু চেষ্টা করছেন। কেউবা নিজেদের দলের নামে পরিবর্তন এনেছেন। শাসনতন্ত্র কেটে শুধু আন্দোলন অথবা আগে ইসলাম পরে বাংলাদেশের পরিবর্তে আগে বাংলাদেশ পরে ইসলাম নিয়ে গেছেন। কেউবা দলীয় স্লোগান 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' পরিবর্তন করে দিয়েছেন। গনতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছেন। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলের তরীকায় জিহাদ করছে তাদের বিরুদ্ধে চরম বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেছেন। কিন্ত তারপরেও তাদের খুশি করতে পারেননি। আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেনও না। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেছেন−

'আর ইয়াহুদি ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা বাকারা, ২:১২০)

তাই ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের শিখানো মন্ত্র গনতন্ত্র বর্জন করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ুন। জেনে রাখুন গনতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করতে বলে অথচ আল্লাহ (সুব.) তা নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন−

'আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।' (সুরা আনআম,

৬:১১৬) তাই আব্রাহাম লিঙ্কনের সুন্নাহ বা তরীকা গণতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে রাসুলের তরীকা জিহাদের পথে ঝাপিয়ে পড়ুন। হয়তো বলবেন ওদের হাতে বিপুল বিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে আমাদের কাছেতো কিছুই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব.) নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ (সুব.) বলেন–

'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' (সুরা আহযাব, ৩৩:২৫) বদরের যুদ্ধে আল্লাহ (সুব.) তা প্রমান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।' (আনফাল ৮:১৭)

জেনে রাখুন! আমাদের দুশমনদের কাছে বিপুল বিদ্ধংসী মারণাস্ত্র রয়েছে কিন্তু আমাদের ঝাড়ে বাঁশ রয়েছে। আমাদের তা নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

'তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।' (সুরা তাওবা, ৯:৪১)
এ আয়াতে হাল্কা বলতে অস্ত্রহীন আর ভারী বলতে অস্ত্র ধারীকে বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। এরপরেও যারা বের হবে না তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আল্লাহ (সুব.) বলেন–

-

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক

আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সুরা তাওবা, ৯:৩৮-৩৯)

তবে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। বরং জিহাদের নামে খালি হাতে মিছিল-মিটিং করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে জীবন দেয়া অথবা টিয়ারশেলের গ্যাসের ঝাঁঝালো ধোঁয়া খেয়ে দৌড়ে পালানো কোনো মুমিনের কাজ নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

'হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরন করবে না।' (আনফাল ৮:১৫) এ জন্য প্রস্তুতি সহ মাঠে নামতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও।' (নিসা ৪:৭১)
এ আয়াতে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

'আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।'(সুরা আনফাল ৮:৬০।)
মুফাচ্ছিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল (সা:) এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন:

- -

»

«

'উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে

এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর' এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। এভাবে তিনবার বললেন।' (সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬)

জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন:

'আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত....।' (সুরা তাওবা ৯:৪৬।)
এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে। জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদের সরঞ্জামাদীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
জেনে রাখুন, আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহর কাছে বিক্রিত জান-মাল আল্লাহর কাছে হস্তান্তর করে জান্নাত লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।' (সুরা তাওবা, ৯:১১১)

জেনে রাখুন! আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে হলে ত্যাগ করেই লাভ করতে হয়। ভোগ করে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন−

‘তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, ‘কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)’? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।’ (সুরা বাকারা, ২:২১৪) আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন–

-

‘তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে। আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতে, তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে। অতএব তোমরা তো তা দেখেছই এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাকাচ্ছিলে।’ (সুরা ইমরান, ৩:১৪২, ১৪৩)

আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন–

‘তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সুরা তাওবা, ৩:১৬)

( )

‘মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।’ (সুরা আনকাবুত, ২৯:২-৩)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

‘খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে চাঁদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর (সা:) কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, ‘তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো। তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন আরোহী সান’আ থেকে হাযরা’মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।’ (বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে –

:

.

‘মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয়। তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা (রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলূন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০।)

-

-

‘আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘ইসলাম অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবস্থায় ফিরে যাবে। কতইনা সৌভাগ্য সেই গোরাবাদের।’ (মুসলিম ৩৮৯)

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমান ভঙ্গের কারণ ও উসূলে তাকফীর

আমাদের সমাজের একদল মানুষের ধারণা যে, একবার ঈমান আনার পরে যত অন্যায় করুক আর ঈমান বিনষ্ট হবে না। আল্লাহকে গালী-গালাজ করুক অথবা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ও উপহাস করুক অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে নিয়ে উপহাস করুক কোনোক্রমেই ঈমান ভঙ্গ হবে না। এ আক্বীদা মূলত 'মুরজিয়া'দের আক্বীদা। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এই আক্বীদার সুত্রপাত হয়েছে। এদেশের মানুষ হয়তো সালাত ভঙ্গের কারণ জানে, সাওম ভঙ্গের কারণ জানে, অজু ভঙ্গের কারণ জানে কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ বেশীরভাগ লোকেই জানে না। সে কারণেই এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ উল্লেখ করছি। যারা দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের লেখা 'কিতাবুল আক্বায়েদ' এর ভিতরে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমান ভঙ্গের মৌলিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১। আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্য কোনো কিছুকে শরীক করা।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর ভরসা করে।

৩। কাফের-মুশরিকদের কাফের-মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা।

৪। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনিত আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে নিয়ে অথবা (পুন্য কাজের) সাওয়াবের বিষয়কে নিয়ে অথবা (পাপের জন্য) শাস্তির কোনো বিষয়কে নিয়ে রং-তামাশা বা বিদ্রুপ করা।

৫। যাদু করা।

৬। মুসলিমদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগীতা করা।

৭। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করা যদিও সে ওই আমলটি নিজে পালন করে।

৮।   কিছু
মানুষ শরিয়তের উর্দ্ধে। তাদের জন্য শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন কতিপয় লোকের আক্বীদা, আধাত্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে শরিয়ত মানার প্রয়োজন নেই।

৯।

যে ব্যক্তি
বিশ্বাস করে যে, নবী (সা:) এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য মানব রচিত বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম। যেমন বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানব রচিত বৃটিশ আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আল্লাহর আইনকে আধুনিক যুগে অচল মনে করা হয়।

১০।   আল্লাহর দ্বীন থেকে
বিমুখ হওয়া বা অমনোযোগী হওয়া।

এগুলো হলো সংক্ষিপ্ত আকারে ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ। এর যে কোনো একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যায় এবং কাফের হয়ে যায়। তবে কোনো সময় বিশেষ কারণে ঈমান ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর (কাফের বলে আখ্যায়িত) করা যায় না। মূলত এখানে দুটি বিষয়। একটি হলো এই যে, উপরোক্ত ঈমান ভঙ্গের কারণগুলোর কোনো একটি যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায় সে কাফের। কিন্তু কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ না করা। এটাকে বলা হয়   বা সাধারণ তাকফীর। আরেকটি হলো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ থেকে কোনো একটি কারণ পাওয়া গেলে সুনির্দিষ্টভাবে তাকে তাকফীর করা হবে। এটাকে বলা হয়   বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যয়িত করা। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। কেননা কোনো মুসলিমকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অনেক সময়ে কোনো ব্যক্তি কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু তার গ্রহণযোগ্য ওজর থাকার কারণে তাকে তাকফীর করা যায় না। এ জাতীয় ওজরগুলোকে বলা হয়   বা কাফের বলে আখ্যায়িত করতে বাঁধা প্রদানকারী কারণ সমূহ। এরকম কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভিতরে কুফুরী পাওয়া সত্ত্বেও তাকে তাকফীর করা থেকে বাঁধা প্রদানকারী কারণসমূহ

যে সকল ওজর সর্বাত্মক চেষ্টা করেও দূর করা সম্ভব নয় এ রকম ওজরের বশীভূত হয়ে কোনো কুফ্‌রী কাজ করে তাহলে তাকে তাকফীর করা যায় না। কেননা আল্লাহ (সুব.) কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বাধ্য করেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।' (বাকারা ২:২৮৬)
আল্লাহ (সুব.) আরো বলেনঃ

'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।' (তাগাবুন ৬৪:১৬)
এ আয়াতে সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। সাধ্যের বাইরে বাধ্য করা হয়নি। সহী হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

...

'আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করি তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো কার্যকর করো।' (বুখারী ৭২৮৮; মুসলিম ৩৩২১)
যে সকল কারণে কুফুরী কাজ করা সত্ত্বেও তাকফীর করা যায় না। সে কারণগুলো নিম্নরূপঃ

এক :

শরিয়তের বিধান না জানার কারণে অজ্ঞতা বশত কুফুরী করা।

অজ্ঞতা এবং শরিয়তের বিধান তার কাছে পৌঁছে নাই। এ কারণে কুফরী কাজে লিপ্ত হয়েছে। এ জন্য তাকে তাকফীর করা যাবে না। বরং তার কাছে বা শরিয়তের বিধান দলীলসহ পেশ করতে হবে। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেনঃ

'আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।' (নিসা ৪:১৬৫)
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

'আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই।' (ইসরা ১৭:১৫)
এ সকল আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ (সুব.) কাউকে আগাম সতর্ক না করে শাস্তি প্রদান করেন না। তাই যাদের কাছে শরীয়তের হুজ্জাত পৌঁছে নাই তাদের কাছে হুজ্জাত পেশ করা জরুরী। তার পরে যদি তারা জেনে শুনে অস্বীকার করে অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা কটাক্ষ করে তাহলে সে অবশ্যই কাফের হবে এবং তাকে তাকফীর করতে হবে। এর অনেকগুলো দলিল রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দলিল পেশ করা হলো–

ক. মদ হারাম হওয়ার পর হালাল মনে করা:
এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পরে মদ হাদিয়া হিসেবে পেশ করলো। এটা মারাত্মক অন্যায়। একদিকে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা হলো। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হারাম জিনিস উপহার দেওয়া হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে তিরস্কার করলেন না। কেননা তার কাছে তখনো মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি পৌঁছেছিলো না। (কাওয়ায়েদ ফীত তাকফির পৃ:৩৭)

খ. কিবলা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা:
কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও কতিপয় লোক বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করছিলো। অথচ এটি একটি বড় ধরণের অন্যায়। কিবলা পরিবর্তনের বিধান নাযিল হওয়ার পরেও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার সমতুল্য। কিন্তু যেহেতু তারা কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি জানতো না সে কারণে তাদের মাজুর হিসেবে নির্দোষ আখ্যায়িত করা হলো। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পরে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। ১৬ মাস অথবা ১৭ মাস এভাবে আদায় করার পরে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো 'আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।' (বাকারা ২:১৪৪) অতঃপর বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যাক্তি দেখতে পেলো লোকেরা ফজরের সালাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এক রাকাআত আদায় করে ফেলেছে। তখন তিনি ডাক দিলেন 'সাবধান, কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। সাবধান, কিবলা পরিবর্তন হয়েছে।' তখন লোকেরা ঐ অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে ঘুরে কিবলার দিকে ফিরে গেলো।' (বুখারী ৭২৫২, মুসলিম ১২০৮, তিরমিযি ২৯৬২, আবু দাউদ ১০৪৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪০৩৪)

গ. চার ব্যক্তির অভিযোগঃ

কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ (সুব.) চার ব্যক্তির ওজর গ্রহণ করবেন এবং তাদের ওখানেই পরিক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। যেহেতু তাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছেনি অথবা পৌঁছালেও শুনতে পায়নি অথবা শুনলেও বুঝতে পারেনি। তাই তাদের সরাসরি জাহান্নামে শাস্তি না দিয়ে পরিক্ষাগ্রস্থ করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

'আসওয়াদ ইবনে সারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- চার ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন। একজন বধির যে কিছুই শুনতে পেতো না। দ্বিতীয় জন বোকা যার কোনো বিবেক-বুদ্ধি ছিলো না। তৃতীয় জন বৃদ্ধ যার কোনো

হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। চতুর্থ জন যে ফাতরাতের সময় মৃত্যু বরণ করেছে। বধির বলবে, হে আল্লাহ! ইসলাম এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি। আহমক, বৃদ্ধ ও অবুঝ শিশু বলবে, হে আল্লাহ! ইসলাম এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আর যে ব্যক্তি ফাতরাতের সময় মারা গেল সে বলবে, হে আল্লাহ! আমার কাছেতো তোমার কোনো রাসূল আসেনি। আল্লাহ (সুব.) তাদের থেকে অঙ্গিকার নিবেন, তোমরা কি আমার বিধান অবশ্যই পালন করতে? অতঃপর আল্লাহ (সুব.) তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠাবেন । যারা তার কথা শুনে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠান্ডা ও আরামদায়ক হবে। আর যারা নির্দেশ অমান্য করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না তাদের আল্লাহর নাফরমান হিসেবে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসনাদে আহমাদ ১৬৩০১

ঘ. আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার অসিয়াত।

এক ব্যক্তি সারা জীবন অসংখ্য অন্যায় ও পাপ করেছে। মৃত্যুর আগে তার ভয় হলো যদি আল্লাহ আমাকে ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না। এ কারণে সে তার সন্তানদের অসিয়াত করলো যে, তোমরা আমার মৃত্যুর পরে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে ফেলবে। অতঃপর ছাইগুলোকে দু'ভাগ করে অর্ধেকটা বাতাসে উড়িয়ে দিবে অর্ধেকটা পানিতে মিলিয়ে দিবে। সন্তানরা তাই করলো। আল্লাহ (সুব.) বাতাসকে হুকুম দিবেন তুমি তোমার অংশ ফেরত দাও আর পানিকে হুকুম দিবেন তুমি তোমার অংশ ফিরত দাও। অতঃপর আল্লাহ (সুব.) তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এ কাজটি কেন করেছো? সে বলবে, আল্লাহ! আমি তোমার ভয়ে করেছি। আল্লাহ (সুব.) তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অথচ, গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এ লোকটি আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে। কেননা তার বিশ্বাস এভাবে ছাই বানিয়ে গুড়িয়ে দিলে তাকে আল্লাহ (সুব.) আর ধরতে পারবেন না। অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট কুফরী আক্বীদা। কিন্তু তার কাছে প্রয়োজনীয় এলমে শরয়ী না পৌছার কারণে এবং তার অজ্ঞতার কারণে। তার এই কুফরীর কারণে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছেঃ

‘আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জনৈক ব্যক্তি জীবনে কখনো কোনো ভাল কাজ করেনি (বরং পাপ করতে করতে সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছিলো এবং নিজের উপরে জুলূম করেছিলো)। (যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন সে তার সন্তানদের অসিয়ত করলো, আমি যখন মরে যাব তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলবে তারপর ছাইগুলো পিশে ফেলবে অতঃপর তোমরা অর্ধের ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিবে আর অর্ধেক সমুদ্রে গুলিয়ে দিবে। কেননা আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না। (সন্তানরা তার মৃত্যুর পরে তার অসিয়ত অনুযায়ী কাজ করলো। আল্লাহ (সুব.) সমুদ্রকে নির্দেশ দিলে সমুদ্র তার ভিতরের অংশ জমা করে দিলো এবং স্থলকে নির্দেশ দিলে স্থল তার অংশ জমা করে দিলো। অতঃপর লোকটিকে জীবিত করে আল্লাহ (সুব.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাজটি কেন করেছো? সে বলবে, আল্লাহ তুমি তো জান এটা আমি তোমার ভয়েই করেছি। আল্লাহ (সুব.) তাকে ক্ষমা করে দিবেন।’ (সহীহ বুখারী ৭৫০৬)

ইসলামের জ্ঞান অর্জণ করার সুযোগ থাকা সত্বেও অর্জণ না করলে অজ্ঞতার ওজর চলবে না।

পক্ষান্তরে যদি শরিয়তের ইলম কারো কাছে পৌঁছে যায় তার পরেও জেনে শুনে অস্বীকার করে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

- -

.

‘আবদুল্লাহ ইবনে অমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন গনীমতের মাল পেতেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দিতেন। তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলে, লোকেরা তাদের প্রাপ্ত গণীমতের মাল নিয়ে তাঁর নিকট আসতো। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ নিয়ে, বাকী অংশ সকলের মাঝে ভাগ করে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি গণীমতের মাল বন্টনের মত একটা চুল বাঁধার ফিতে নিয়ে আসে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটি

গনীমতের মাল হিসাবে পেয়েছি। তখন তিনি বলেন, তুমি কি বিলাল (রা.) এর তিনটি ঘোষণা শুনেছিলে? সে বলে, হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন, সে সময় কিসে তোমাকে এটি উপস্থিত করা থেকে বিরত রেখেছিল? তখন সে (লোকটি) তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করে। তখন তিনি বলেন: তুমি এভাবেই থাক! তুমি কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে এবং আমি তা তোমার থেকে কবূল করব না। (আবু দাউদ ২৭১৪)
চিন্তা করুন! কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটির ওজর গ্রহণ করলেন না। কেননা তার কাছে বেলালের ঘোষণা পৌঁছেছিল। এরকমই একটি বিষয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

- -

‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন: সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রাণ, বর্তমান মানবগোষ্ঠীর কোনো ইয়াহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শুনার পর যে দ্বীন নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করলো সে নিশ্চিতই জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।’ (মুসলিম ৪০৩)
সতর্কতা: এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো তা ছিলো শরিয়তের বিধান সম্বলিত ইলম না পৌঁছার কারণে অজ্ঞতাবশত অন্যায় করে তাহলে শাস্তি হবে না। কিন্তু শরিয়তের ইলম পৌঁছার পরে অলসতা বশত বা গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে যদি অজ্ঞ থাকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পার্থিব ব্যাবসা-বানিজ্য, চাকরি-নকরি ও বাজার ঘাট করার জন্য সময় ব্যায় করতে পারলেও দ্বীনি ইলম অর্জণ করার জন্য সময় ব্যায় করতে রাজি নয়। এ কারণে যদি অজ্ঞ থাকে সেই অজ্ঞতার ফলে সে অন্যায় ও কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে একদিকে যেমন অন্যায় ও কুফরীর গুনাহে গুনাহগার হবে অপর দিকে ইলমে দ্বীন অর্জণ করা ফরজ হওয়া সত্বেও তা না করার গুনাহে গুনাহগার হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

‘যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে।’ (ইবরাহীহ ১৪:৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

-

-

‘এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।’ (নাহাল ১৬:১০৭-১০৯)

দুই :

কোনো আয়াত বা হাদীসের অর্থ বুঝতে ভুল করা অথবা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অবকাশ থাকা।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী কাজ করা সত্ত্বেও কাফের হয় না তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: কুরআনের কোনো আয়াত অথবা হাদীসকে ভূল বুঝা এবং সে ভূল বুঝার জন্য গ্রহণযোগ্য কারণ আছে এমনিভাবে কোনো আয়াতের বা হাদীসের ভূল তাবীল করার কারণে যে ভূল তাবীল করার গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ আছে। হয়তো ঐ আয়াত বা হাদীসের আভিধানিক অর্থের কারণে ভূলবুঝা বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। অথবা অন্য কোনো কারণে এই ভূল বুঝা বা ব্যাখ্যা কারা সুযোগ হয়েছে। নতুবা মনগড়া তাবীল বা ব্যাখ্যা এবং কুরআন ও হাদীসকে নিজেদের ইচছাম মতো ঘুরানো ফিরানো জায়েজ নেই। যেমন ভন্ড পীর-সূফীরা নিজেদের পক্ষে দলীল পেশ করার জন্য অপব্যাখ্য করে থাকে। এ জাতিয় অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়াতো দূরের কথা বরং কুরআন ও হাদীসের বিকৃতী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরণের অপব্যাখ্যাকারীদের জিন্দিক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কুরআন ও হাদীসের নসের ভিতরে তাবীলের অবকাশ থাকার কারণে যে ভূল হতে পারে তা কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো:

ক. আদী ইবনে হাতেমের সাদা সুতা ও কালো সুতার ঘটনা।

'আদী (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার কাছে সাদা কালোর কোনো ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সা.) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতো তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে।'
(বোখারী ৪৫০৯; মুসলিম ২৫৮৫)
এ হাদীসে দেখা যায়, সাহাবী আদী ইবনে হাতেম (রা.) সুবহে সাদেকের পরেও খাওয়া-দাওয়া করেছেন আয়াতের অর্থ ভূল বুঝার কারণে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আয়াতের সঠিক অর্থ শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তাকে উক্ত সওম কাজা করতে বলেননি। কেননা এখানে আয়াতের শব্দের মধ্যে তার এই ভূল বুঝার অবকাশ ছিল। সে কারণে তার ওজর গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. আসমা বিনতে উমাইস (রা.) এর ইসতেহাজার কারণে সালাত আদায় না করা।

» - - .

'আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ অনেক দিন থেকে ইসতিহাজায় আক্রান্ত। এ সময়ে সে কোনো সালাত আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। (তার করণিয় হলো) সে একটি পানির গামলায় বসবে। যদি পানির উপর রক্তের আভাস দেখে তাহলে জোহর ও আসরের জন একবার গোসল করবে, মাগরীর ও ইশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। আর এর মাধ্যবর্তী সময়ে (যতবার ইচ্ছা) অজু করতে পারবে।' (আবু দাউদ ২৯৬)
এই হাদীসে দেখা যায়, ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ ইসতিহাজা অবস্থায় সালাত আদায় করেননি। অথচ সালাত ত্যাগ করা গুনাহে কাবীরা। তা সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে মাসআলা শিক্ষা দিলেন

আর কোনো তিরস্কার করলেন না। এমনকি উক্ত সালাতগুলো কাজা করতেও বলেননি।

কেননা তার এই সালাত ত্যাগ করা ইচ্ছাকৃত ছিলো না। বরং হায়েজ অবস্থায় সালাত আদায় করা থেকে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসগুলোর কারনেই সালাত ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন হায়েজ আর ইস্তেহাজা এক নয় বরং ইস্তিহাজা অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে তখন তিনি তা মেনে নিলেন।

গ. ‘তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না’ এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা। এ আয়াতে মূলত জিহাদ ত্যাগ করে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ব্যাবসা-বানিজ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়াকে আত্মঘাতী বা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একদল মানুষ আয়াতের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি জিহাদ থেকে বিরত থাকার ভূল ব্যাখ্যা করে নিজেরা এবং অন্যদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য এ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে। বিশেষ করে যারা জীবনের ঝুকি নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুদের ভিতরে ঢুকে পরে এবং বর্তমানে যারা কাফেরদের উপর আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে কাফেরদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করছে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এ জন্য আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) তাদের ভূল ব্যাখ্যা সংশোধণ করে দিলেন। হাদীসের বিস্ত ারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো:

:

. :

:

) :

(

.

‘আসলাম আবূ ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনা হতে কুস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রাহমান। রোমের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এমতাবস্থায় একব্যক্তি শত্রু-সৈন্যের উপর অক্রমন করে বলল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল, থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে তো নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, (অনুচ্ছেদে বর্ণিত) এ আয়াত

আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহর নবীকে আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায়-সম্পদ দেখাশুনা করব এবং সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন: আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।' (আবু দাউদ ২৫১৪, বায়হাকী ১৮৬৫৯)

লোকেরা এ আয়াতের ভুল ব্যখ্যা করলো এবং কোনো ব্যক্তির একাকী নিজেকে কাফের সৈনিকদের ভিতরে প্রবেশ করায় তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলো এবং এটাকে আত্মঘাতি বলে আখ্যায়িত করলো। আর এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ হালাল কাজ বরং জিহাদের ময়দানে নিজেকে উৎসর্গ করার কাজকে হারাম বলে ঘোষণা করলো। এর একমাত্র কারণ ছিলো আয়াতের অর্থ ভুল বোঝা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা। পরে আবু আইউব আনসারী (রা.) তাদের ভুল সংশোধন করে দিলেন এবং তিনি জানিয়ে দিলেন তারা যে অর্থ করেছে সে অর্থে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়নি। বরং এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে যারা জিহাদে না গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির পিছনে লেগেছিলো। এখানে জিহাদ না করাকে আত্মঘাতী ও নিজেদেরকে ধ্বংসের হাতে ঠেলে দেওয়া বলা হয়েছে। অথচ ঐ লোকগুলো সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাখ্যা করেছিলো। যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দুশমনদের ভিড়ের ভিতরে ঢুকে পড়লো তাকেই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে জিহাদের ময়দান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হলো। এত বড় ভূল করা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো তিরস্কার করলেন না। কেননা আয়াত থেকে এই ভুল ব্যাখ্যা করা ও ভুল বুঝার অবকাশ ছিলো। কিন্তু ভুল সংশোধন করে দেওয়ার পরেও যদি কেউ ভুল বুঝতে না চায় বরং অস্বীকার করে তাহলে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘ. 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।' (মায়েদা ৫:১০৫) এই আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা।

কতিপয় লোকেরা উপরোক্ত আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা করে এবং আয়াতকে যথাস্থান থেকে বিকৃত করে অপাত্রে ব্যাবহার করেছে এবং এর মাধ্যমে লোকদেরকে 'আমর বিল মা'রুফ-নাহী 'আনিল মুনকার' ত্যাগ করে নির্জনে খানকায় বা মসজিদে বসে ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে

লাগলো। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হামদ ও সানা পাঠ করে ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

)

- (

» -

‘হে লোক সকল তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক ‘হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না’। কিন্তু তোমরা যথাস্থান বাদ দিয়ে অনত্রে প্রয়োগ করো। অথচ খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যখন লোকেরা কোনো জালেমকে জুলুম করতে দেখে কিন্তু তাকে বাঁধা দেয় না তখন আল্লাহ (সুব.) তাদের সকলকেই আমভাবে শাস্তি দিবেন।’ (আবু দাউদ ৪৩৪০; মুসনাদে আহমদ ৫৩)

যদিও লোকগুলো আয়াতের প্রয়োগ ক্ষেত্র পাল্টে দিয়েছিলো। যা মূলত ইয়াহুদী-নাসারাদের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

‘তারা (আল্লাহর) কালামসমূহকে যথাস্থান স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে।’ (নিসা ৪:৪৬)

কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঐ লোকগুলোকে সতর্ক করেই ক্ষ্যান্ত হলেন। তাদের ইয়াহুদী-নাসারা বা কাফের বলে আখ্যায়িত করেননি। কেননা তারা এটা ইচ্ছা করে করেননি। বরং আয়াতের ভিতরে এরকম ভূল বুঝার অবকাশ ছিল বিধায় তারা করেছিলো। আবু বকর (রা.) যখন তাদেরকে সতর্ক করলেন তখন তারা বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছিলো।

তিন : নও মুসলিম হওয়া

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি করা সত্ত্বেও কাফের বলা যায় না তার মধ্যে আরেকটি হলো ইসলামে নতুন প্রবেশ করা। ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট জ্ঞান অর্জণ করার সুযোগ না পাওয়ায় ইসলাম বিরোধী কোনো গুনাহের কাজ বা কুফুরী করে বসলো। এ কারণে তাকে মুরতাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না বরং তার নিকট শরিয়তের হুজ্জত উপস্থাপন করতে হবে। বিশেষ করে যে বিষয়টিতে সে লিপ্ত হয়েছে সে বিষয়টি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান তার সামনে তুলে ধরতে হবে। কেননা ইসলাম গ্রহণ করার পরে প্রথম দিনেই

সকল আক্বায়েদ এবং ফারায়েজ জানা সম্ভব নয়। আর এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী শরিয়তে ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কাউকে বাধ্য করা হয় না। ইসলামে নতুন আসার কারণে শিরকী ও কুফুরি কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকফীর করা হয়নি এমন কিছু দলীল নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ক. 'যাতে আনওয়াত' নামক শিরকি কাজের আবেদন।

মক্কা বিজয়ের দশ থেকে পনের দিন পরে হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে 'যাতে আনওয়াত' নামক মুশরিকদের একটি কুল বৃক্ষ নজরে পরলো। যেটার সাথে মুশরিকরা বরকত হাসীলের উদ্দেশ্যে তরবারী ঝুলিয়ে রাখতো। যেরকম বর্তমানে কিছু মুশরিকরা নির্দিষ্ট গাছে বরকতের উদ্দেশ্যে সুতা বাঁধে। যখন ঐ বৃক্ষ সাহাবীদের নজরে পড়লো তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আবেদন করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওদের যেরকম একটি 'যাতে আনওয়াত' রয়েছে আমাদের জন্যও সেরকম একটি 'যাতে আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূলূল্লাহ (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এতো দেখছি সেই হুবহু বনি ইসরাঈলদের মতো আবেদন, যখন তারা কতিপয় লোকদের মূর্তী পূজা করতে দেখেছিলো তখন তারাও মুসা (আ.) এর নিকট ঐ রকম কিছু মূর্তী তৈরী করে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলো। তারা বলেছিলো, 'তাদের যেমন দেবতা আছে আমাদের জন্যও তেমনি দেবতা নির্ধারণ করে দিন।' বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসটিতে রয়েছেঃ

আবু ওয়াকেদ আল লাইসি (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হুনাইনের দিকে (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে একটি কুল বৃক্ষ দেখা গেল যেটাতে কাফেররা বরকত হাসিলের জন্য নিজেদের তরবারী ধুলিয়ে রাখতো অথবা সুতা বেধে রাখতো এবং উক্ত গাছের চর্তুদিকে তারা অবস্থান করতো অথবা তওয়াফ করতো। ঐ বৃক্ষটি 'যাতে আনওয়াত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটা দেখে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য একটি যাতে আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন যেমনি ভাবে কাফেরদের জন্য একটি 'যাতে আনওয়াত' রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আশ্চর্য হয়ে উত্তরে বললেন, আল্লাহু

আকবার! এটাতো সেই বনী ইসলাঈলদের মতো আবেদন যারা মূসা (আ.) কে বলেছিলো, ‘কাফেরদের যেমন দেবতা রয়েছে আমাদের জন্যও তেমন দেবতা নির্মাণ করে দিন।’ নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের অনুসরণ করবে।’ (তিরমিজি ২১৮০; মুসনাদে আহমদ ২১৮৯৭)

এ হাদীসে দেখা গেল যে, এতবড় একটা শিরকযুক্ত আবেদন করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে তাকফীর করেন নি এবং তাদের মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেন নি। কেননা তারা এ কাজটি করেছিলো নও মুসলিম হওয়ার কারণে এ বিষয়ে ইলম না থাকার কারণে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে তারা মাত্র পনের দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। যা তারা নিজেরাও ওজর হিসেবে উল্লেখ করেছে। তারা বললোঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জাহিলিয়্যাতের যুগটি খুবই নিকটে। সবেমাত্র আমাদেরকে আল্লাহ (সুব.) ইসলামে নিয়ে আসলেন... ।’

খ. সালাতের ভিতরে কথা বলা সত্ত্বেও পুনরায় সালাত আদায় করতে না বলা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

-

. -

.

-

-

‘মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী থেকে বর্ণীত। তিনি বলেছেনঃ কোন একসময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সালাত পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে (সালাত আদায়কারীদের মধ্যে) কোনো একজন হাঁচি দিলে জবাবে আমি ইয়ার হামুকাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। বললাম। এতে সবাই রুষ্ট দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাতে থাকলো। তা দেখে আমি বললামঃ আমার মা আমার বিয়োগ ব্যাথায় কাতর হোক। (অর্থাৎ এভাবে আমি নিজেই নিজেকে ভৎর্সনা করলাম) কি ব্যাপার! তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো যে? তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপিয়ে শব্দ করতে থাকলো। (আমার খুব রাগ হওয়া সত্ত্বেও) আমি যখন দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চায় তখন আমি চুপ করে রাইলাম। পরে

রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত শেষ করলে আমি তাকে সবকিছু বললাম। আমার পিতা ও মা তার জন্য কোরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে বা এর পরে আর কখনো অন্য কোনো শিক্ষককে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না বা মারলেন না কিংবা বকা-ঝকাও করলেন না। বরং বললেন: সালাতের মধ্যে কথাবার্তা ধরণের কিছু বলা যথোচিত নয়। বরং প্রয়োজন বশত: তাসবীব, তাকবীর বা কুরআন পাঠ করা যেতে পারে মাত্র।' (মুসলিম ১২২৭; আবু দাউদ ৯৩২; নাসায়ী ১২১৭; মুসনাদে আহমদ ২৩৭৬২)
এই হাদীসে দেখা গেল যে, সালাতের ভিতরে কথা বলা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বললেন না। কেননা তারা জাহেলিয়্যাতের থেকে নতুন ইসলামে আসার কারণে এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

গ. স্বর্নের ক্রশ গলায় দিয়ে আদী ইবনে হাতেমের রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে আসা। তিরমিজির হাদীসে বর্নিত হয়েছে:

- -

...

'আদী ইবনে হাতেম তাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে আমার গলায় স্বর্ণের ক্রশ বাঁধা ছিল।' (তিরমিজি ৩০৯৫; বায়হাকী ২০৮৪৭)
আদী ইবনে হাতেম যখন মুসলিম অবস্থায় আল্লাহ রাসূল (সা.) এর কাছে এলেন তখন তার গলায় একটি স্বর্ণের ক্রশ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আদী! তোমার গলা থেকে এই মূর্তীটাকে সরাও। তাকে এর বেশী আর কিছু বললেন না। অথচ ইসলাম গ্রহণ করার পরে গলায় ক্রশ ঝুলানো শিরক সমতুল্য গুনাহ। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে তাকফীর করেন নি। কেননা নওমুসলিম হওয়ার কারনে তার বিষয়টি জানা ছিল না। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ক্রশটি ফেলে দিতে বললেন।

চার :

বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করা যেখানে ইসলামের জ্ঞান পৌঁছা অসম্ভব।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়া সত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি কারণ হলো এমন কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করা যেখানে কুরআন

হাদীসের তথা ইসলামের জ্ঞান পৌঁছানো সম্ভব নয়। যেমন আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যারা বসবাস করে। বিচ্ছিন্ন পাহাড়-জঙ্গলে যারা বসবাস করে। যেখানে না কোনো ইলম পৌঁছানো সম্ভব আর না তারা ইলমের কাছে পৌঁছতে পারে। এ কারণে অজ্ঞতা বশত যদি কোনো ইসলাম বিরোধী কুফরী কাজে লিপ্ত হয় এজন্য তাদেরকে তাকফীর করে মুরতাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। যতক্ষণ না তাদের উপর ইকামাতে হুজ্জত বা কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে দলীল হিসেবে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলোঃ

ক. দুই সময়ে দুই রকম বিধান।

'নিশ্চয়ই তোমরা এমন একটি জমানায় অবস্থান করছো যখন ওলামা অনেক বেশী, বক্তা কম। এ সময়ে যে ব্যক্তি সৎকাজ সমূহের দশ ভাগের একভাগ ত্যাগ করবে সে অবশ্যই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। আর অচিরেই এমন একটি জামানা আসবে যখন বক্তা অনেক বেশী হবে কিন্তু প্রকৃত আলেমদের সংখ্যা কম হবে। তখন যে ব্যক্তি সৎকাজ সমূহের দশভাগের একভাগ শক্তভাবে ধরে রাখবে সেও নাজাত পাবে।' (আস সিলসিলাতুস সাহীহাহ ২৫১০)
এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই যমানার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যে যমানায় আলেম ওলামা ও ইলমের চর্চা বেশী হবে সে সময়ে দশভাগের একভাগ ত্যাগ করলেও ধ্বংস ও আযাবে পতিত হবে। আর যখন ইলম ও আলেম ওলামা কমে যাবে তখন দশভাগের একভাগ আমল করলেও মুক্তি পাবে। এমনিভাবে আরেকটি হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ

হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইসলাম পুরাতন হয়ে পরবে যেরকম ভাবে কাপরের নকশা ব্যবহার করতে করতে পুরাতন হয়ে যায়। এমনকি মানুষ জানবে না সিয়াম, সালাত, কুরবানী, সাদাকা কি জিনিষ। আর আল্লাহর কিতাব কুরআনের উপর দিয়ে এমন একটি রাত অতিক্রম করবে যখন আর কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না। তখন একদল বুড়া-বুড়ি থাকবে যারা শুধু এতটুকু বলতে পারবে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালেমাটি পাঠ করতে শুনতাম তাই আমরাও পাঠ করছি। তখন হাদীসের বর্ণনাকারী সিলাহ (র.) বলেন, আমি হুজায়ফা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেহেতু তারা সালাত, সিয়াম, কুরবানী, সাদাকা কিছুই জানবে না সেহেতু তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি তাদের মুক্তি দিতে পারবে? তখন হুজায়ফা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনবার এরকম প্রশ্ন করলে তিনবারই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শেষবারে বললেন, হ্যাঁ! হে সিলাহ! এই কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাদের মুক্তি দিবে। একথা তিনি তিনবার বললেন।' (ইবনে মাজাহ ৪০৩৯; সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৮৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন জমানায় বা এমন স্থানে বসবাস করে যে সময় বা যে স্থানে ইলম অর্জণ করার সুযোগ থাকবে না। এমনকি যদি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বাক্ষ্য দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু না জানে। সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না। আর এই নাজানার কারণে আমলও করতে পারে না তাহলে তাদের এই না জানাটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যেখানে ইলম অর্জণ করার সুযোগ আছে সেখানে ইলম অর্জণ না করে এই ওজর পেশ করা যে, না জেনে গুনাহ করলে অসুবিধা নেই এটি একটি মারাত্মক অন্যায়। এটা মুরজিয়া, জাহমিয়াদের আক্বিদা। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক আক্বীদা নয়। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক আক্বীদা হলো, ইলম অর্জণ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা ইলম অর্জণ করলো না তারা ডাবল গুনাহগার হলো। একেতো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ। আর দ্বিতীয়ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না জানার গুনাহ।

পাঁচ : অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি কাজ করা সত্ত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে একটি হলো

অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি। মুখ ফসকে অথবা ভূলে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কুফরি কথা বা কাজ করে ফেলে সে জন্য তাকে তাকফীর করা যাবে না। এর দলীল নিম্নে পেশ করা হলো:

ক. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

'আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

খ. রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেন:

নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) আমার উম্মতের থেকে অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি-বিচুত্যি, ভূল-ভ্রান্তি ও জোড় জবরদস্তি করে যা করানো হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (ইবনে মাজাহ ২০৪৫)

গ. হে আল্লাহ! তুমি আমার গোলাম, আমি তোমার রব' সংক্রান্ত হাদীস:

» - - - -

'আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর বান্দা যখন তার কাছে তওবা করে সে বান্দার তওবায় মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হন যে ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে কোন জনমানবহীন প্রান্তরে পৌঁছে যায়। এবং সেখানে পৌঁছে তার থেকে তার সওয়ারীটা উধাও হয়ে গেল। অথচ সওয়ারীর পিঠে তার খাদ্য পানীয় সহ যাবতীয় রসদ রয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি সওয়ারী থেকে নিরাশ হয়ে একটা বৃক্ষের নিকট এসে বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। হতাশা ও নিরাশার মাঝে সে একাকী শুয়ে আছে। এমন সময় হঠাৎ দেখল তার সওয়ারীটা তারই পাশে দণ্ডায়মান। তখন সে ঝটপট সেটার লাগাম ধরে ফেলল। অতঃপর আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ফেললো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দাহ ও আমি তোমার রর।' (মুসলিম ৪১৩৬)

এখানে লোকটি কত মারাত্মক কথা বলে ফেললো। একেতো নিজেকে রব দাবী করলো দ্বীতিয়ত: সে আল্লাহকে নিজের গোলাম বলে আখ্যায়িত করলো। কিন্তু যেহেতু সে ইচ্ছে করে বলেনি। মুখ ফসকে ভুলে বের হয়ে গেছে সে জন্য আল্লাহ (সুব.) তাকে পাকড়াও করবে না।

ছয় : ইজতিহাদ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরি কাজ করা সত্ত্বেও তাকফীর করা যায় না। তার মধ্যে আরেকটি হলো ইজতিহাদী ভূল। কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে মাসআলা-মাসায়েল বের করার নাম হলো ইজতিহাদ। ইজতিহাদ কখনো সঠিক হয় আবার কথনো ভূলও হতে পারে। আর এ কারণে কখনো হালালকে হারাম আবার কখনো হারামকে হালাল বলে ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত দেওয়া হতে পারে আর আল্লাহর হারামকে হালাল জ্ঞান করা বা হালালকে হারাম জ্ঞান করা কুফুরী কাজ। তা সত্ত্বেও মুজতাহিদ, মুফতী বা বিচারককে তাকফীর করা যাবে না। কেননা তার এই ভূলটি ইজতিহাদী ভূল। আর মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারলে তার জন্য দুটো পুরষ্কার আর যদি ভূল করে তাহলেও ইজহিতাদ করার জন্য একটি পুরষ্কার পাবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছেঃ

'অমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন, যখন কোনো বিচারক ফয়সালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সমাধান বের করতে সক্ষম হয় তখন তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। আর যদি ভূল সমাধান বের করে তবুও তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে।' (বুখারী ৭৩৫২; মুসলিম ৬)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

'বিলাল (রা.) উন্নত মানের খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এগুলো কোথা থেকে এসেছো? বিলাল (রা.) বললেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ খেজুর ছিল। নবী (সা.) কে

খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এর এক সা’ এর বিনিময়ে আমাদের দুই সা’ (নিম্নমানের) খেজুর বিক্রি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হায়! এতো একেবারে সুদ। এরূপ করোনা, বরং যখন তুমি (উত্তম) খেজুর খরিদ করতে চাও, তোমার (খারাপ খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। এরপর তার মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ করো।’ (বুখারী ২৩১২)

এ হাদীসে দেখা গেল যে, বেলাল (রা.) সুদের কারবার করে ফেললেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

- -

‘রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহণ কারী, প্রদান কারী, সুদের বিষয় যে লিখে এবং যারা সাক্ষ্যি হয় সকলের উপর লা’নত করেছেন এবং বলেছেন তারা সকলেই গুনাহের ক্ষেত্রে সমান।’ (মুসলিম ৪১৭৭)

এত বড় গুনাহ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলালকে অভিশাপ দিলেন না বা ধমকও দিলেন না। কেননা বেলাল একাজটি করেছিলো ভূল ইজতিহাদ করার কারণে।

হাদীসে উসামাঃ

উসামা বিন যায়েদ (রা.) যুদ্ধের ময়দানে কতিপয় লোককে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও হত্যা করেন। তার ধারণা ছিলো এই লোকগুলো শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ঘোষণা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জানার পরে তিরস্কার করেছেন। কিন্ত এ জন্য উসামা বিন যায়েদের বিরূদ্ধে কিসাস বা দিয়াত কোনো কিছুই জারী করেননি। কেননা তার এ ভূলটি ছিল ইজতিহাদী ভূল। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

'উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এক জিহাদ অভিযানে পাঠালে, আমরা প্রত্যুষে 'জুহাইনার' (একটি শাখা গোত্র) 'আলহুরাকায়' গিয়ে পৌছলাম। এ সময় আমি এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরে ফেলি। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বললো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিন্তু আমি তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেললাম। কালেমা পড়ার পর আমি তাকে হত্যা করেছি বিধায়, আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হলো। তাই ঘটনাটি আমি নবী (সা.) এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: তুমি কি তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর হত্যা করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সে অস্ত্রের ভয়ে জান বাঁচানোর জন্যেই এরূপ বলেছে। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখলে না কেনো যে, এ বাক্যটি অন্তর থেকে বলেছিলো কি না? তিনি এ কথাটি বারবার আবৃত্তি করতে থাকলেন। আর আমি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকলাম, হায়! যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম! বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) টিপ্পনি দিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো কোনো মুসলমানকে হত্যা করবো না, যেভাবে এ পেটুক (উসামা) মুসলমানকে হত্যা করেছে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ তা'আলা কি এক কথা বলেননি যে, 'তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করো, যে পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ না হয়ে যায়? এর জবাবে সা'দ (রা.) বললেন, আমরা জিহাদ করি, যাতে ফিৎনা না থাকে, কিন্তু তুমি আর তোমার সঙ্গীগণ এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, যেনো ফিৎনা সৃষ্টি হয়। (মুসলিম ২৮৭; আবু দাউদ ২৬৪৫)

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এটি যুদ্ধের ময়দানের ঘোষণা। যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঘোষণা দেওয়ার পর কোনো পরিপন্থি কাজ করেনি। তাই এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা.) ও আল্লাহর আয়াত ও বিধান নিয়ে কটাক্ষকারী মুসলিম নামধারী নাস্তিক-মুরতাদ ও ব্লগারদের রক্ষা করা জন্য দলীল পেশ করা যাবে না। কেননা তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বুঝে–শুনে কুফরী কাজ করেছে। এমনিভাবে এই উসূলের ভিত্তিতে কুরআন সুন্নাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনে দেশ শাসনকারী শাষক গোষ্টি ও বিচারকদের রক্ষা করার চেষ্টা করা যাবে না। কেননা তারা কুরআন সুন্নাহর বিধান দিয়ে মাসআলা মাসায়েল বের করতে গিয়ে ইজতিহাদী ভূল করে না বরং তারা সরাসরি আল্লাহর বিধানকে জেনে শুনে প্রত্যাখান করে মানবরচিত আইন বিধান দিয়ে দেশ শাসন করে ও বিচার কার্য পরিচালনা করে তারা তাগূত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

‘তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বা-গুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।’ (নিসা ৪:৬০)
এরা নিজেদেরকে মুমিন দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয়। এ কথা আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে কসম করে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।’ (নিসা ৪:৬৫)
এ আয়াতে বুঝা গেলো কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দন্দ্ব রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে সঁপে না দেয় তাহলে সে মুমিন হবে না। শুধু তাই নয় আল্লাহর বিধান নাযিল হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করার ব্যপারে কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। বরং সকলকে এক বাক্যে মেনে নিতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

‘আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।’ (আহযাব ৩৩:৩৬)
এরপরেও যারা আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করবে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে অথবা এ কথা বলে যে, এগুলো বর্তমান আধুনিক যুগে চলে না। এগুলো মধ্যযুগীয় বর্বব আইন, কিংবা মনে করে এসকল আইন বর্তমান যুগে কার্যকর করা সম্ভব হলেও তার চেয়ে বৃটিশ আইন বা মানব রচিত অন্য আইন বেশী ফলপ্রসূ এ ধরণের আক্বিদা-বিশ্বাস নিয়ে যারা মানব রচিত সংবিধান ও আইনের অধিনে বিচার-ফয়সালা করে তাদের ব্যাপারে

আল্লাহ (সুব.) বলেন:

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (মায়েদাহ ৫:৪৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই যালেম।" (মায়েদাহ ৫:৪৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক।" (মায়েদাহ ৫:৪৭)

সতর্কতা: ইজতিহাদী ভূলের কারণে তাকফীর করা যাবে না এটা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যার ইজহিতাদ করার মতো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে ভূল করে ফেলে। কিন্তু এর দ্বারা কোনো অযোগ্য, জাহেল মুফতী যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তাদেরকে রক্ষা করা যাবে না। এমনিভাবে কোনো দরবারী আলেম অথবা বেদআতী আলেম যাদের যোগ্যতা আছে ঠিকই এবং দলীল প্রমাণের দ্বারা কোনটি হক তাও জানেন তবে নিজেদের বিদআতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অথবা জালিম শাসকদের খুশি করে পার্থিব ফায়দা লুটতে চায় তারা এই ক্ষমার অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) জাহান্নামের আগুনের সুসংবাদ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

নবী (সা.) বলেছেন, বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাতে যাবে এবং দু'শ্রেণী জাহান্নামে যাবে। আর যে জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি তো এমন, যে সত্যকে জানার পর সে আনুযায়ী বিচার করবে। পক্ষান্তরে, যে বিচারক সত্যকে সত্য হিসাবে জানার পরও স্বীয় বিচারে জুলুম করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ভুল বিচার করবে, সেও জাহান্নামে যাবে।' (আবু দাউদ ৩৫৭৫)

সাত : বাধ্য করা

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী কথা বা কাজ করা সত্ত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি

হলো বা জোর জবরদস্তি করে কাউকে কুফুরী কাজে বাধ্য করা। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি সে এই কুফুরী কথা বা কাজ না করে তাহলে তাকে হত্যা বা কোনো কঠিন শাস্তি দিবে এবং সে ঐ শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এ অবস্থায় যদি অন্তরে দৃঢ় ঈমান ধারণ করে শুধুমাত্র মুখে কুফুরি কথা উচ্চারণ করে অথবা কোনো কুফুরী কাজ করে এবং এতে অন্য কারো জীবন নাশ বা মারাত্মক ক্ষতি জড়িত না থাকে তবে তাকে তাকফীর করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নে পেশ করা হলো:

ক. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

‘যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।’ (নাহল ১৬:১০৬)

খ. অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) বলেন,

‘মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।’ (আল ইমরান ৩:২৮)

গ. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

‘নিশ্চয় আল্লাহ (সুব.) আমার উম্মত থেকে অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি, ভূল-ভ্রান্তিও জোর-জবরদস্তি মূলক অন্যায় কাজ ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (বায়হাকী ১৫৪৬০)

ঘ. অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

: :

:

‘মুশরিকরা আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে গ্রেফতার করে চরম শাস্তি দিয়ে তার মুখ থেকে নানা ধরণের কুফুরী কথা বের করার চেষ্টা করলো। এ রকম

কিছু কথা বলেও ফেললেন। পরবর্তীতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উত্থাপণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন, ঈমানের উপর স্থির ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি তারা তোমার সাথে আবারও এ ধরণের আচারণ করে তুমিও তখন ওরকম কথা বলে ছুটে আসবে।' (নসবুর রায়াহ ৭/২১৭; ইত্তিহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ ১৩৫; আল মাত্বালিবুল আলিয়া ২৯১০)

আট :

কোনো বড় মারাত্মক কুফুরকে নির্মূল করার জন্য কুফুরি প্রকাশ করা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়ার পর যে সকল কারণে কুফুরী করা সত্ত্বেও তাকফীর করা যায় না তার মধ্যে আরেকটি কারণ হলো, কোনো বড় কুফুরকে ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য যদি তুলনামূলক কম ক্ষতিকর কোনো কুফুরীতে লিপ্ত হতে হয় এবং এছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে যদি কেউ কুফুরি কথা বা কাজ করে ফেলে তাহলে তাকে তাকফীর করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ কোনো বড় কাফের অথবা তাগূত অথবা আইম্মাতুল কুফুর বা আউলিয়াউশ শয়তান হত্যা করতে হলে তার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া অথবা তার দলে যোগ দেওয়া এবং বাহ্যিকভাবে তার আনুগত্য প্রকাশ করা কিন্তু মনে মনে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাগূতের মুলোৎপাটন করে তার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্ত করা। তাহলে তার জন্য কোনো কুফুরী কথা মুখে উচ্চারণ করা বৈধ হবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নে পেশ করা হলো।

ক. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রা.) এর হাদীসঃ

'জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,নবী (সা.) একবার বললেন, কে আছ যে কাব ইবনে আশরাফ এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল (সা.) কে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কাব ইবনে

আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী (সা.) আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদাকা চাচ্ছে। রাবী বলেন, তখন কাব বললো, এখন আর কি হয়েছে? তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ট হয়ে পড়বে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করেছি, এখন তাঁর পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না। রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।' (বুখারী ৩০৩১)

এখানে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ইয়াহুদি কাব ইবনে আশরাফের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে অনেকগুলো স্পষ্ট কুফুরী কথা রয়েছে। যা প্রকাশ করা বা মুখে উচ্চারণ করা সাধারণ অবস্থায় কোনো ক্রমেই জায়েজ হতে পারে না। তবে তিনি যেহেতু ইসলামের চরম দুশমন কাফের লিডারকে মূলোৎপাটন করার জন্য এ কথা গুলো বলেছেন সে কারণে তাকে তাকফীর করা যাবে না। এই হাদীসে কয়েকভাবে কুফুরী কালাম রয়েছে:

১. সে আমাদের কাছে সাদাকা চায় অথচ আমরা খেতেও পাইনা।

২. সে আমাদের বিরক্ত করে ফেলেছে।

৩. আল্লাহ কসম! সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে। কাব ইবনে আশরাফের এ কথার সুযোগও হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার কথা 'সে আমাদের বিরক্ত করে ফেলেছে' থেকে।

৪. আমরা তাকে এই মূহুর্তে ত্যাগ করা পছন্দ করছি না। দেখি! তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাড়ায়। অর্থাৎ তার সঙ্গে আমাদের অবস্থান করা পরিক্ষা মূলক। যদি পরিণতি ভাল হয় তাহলে আমরা তার সঙ্গে থাকবো আর যদি বিপরীত হয় তাহলে আমরা তাকে ত্যাগ করে তার থেকে আলাদা হয়ে যাব।

এছাড়া এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনায় আরো কিছু শব্দ রয়েছে। এক রেওয়াতে রয়েছে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সঙ্গি আবু নায়েলাহ বলেছিলো: 'আমরা তার সাহায্য সহযোগীতা ছেড়ে দিয়ে তাকে অপমান করতে চাই এবং তার থেকে আলাদা হতে চাই।' আরেক রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কাব ইবনে আশরাফ বলেছিলো, 'তুমি আমাকে হাসালে।' এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ করা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মূলক কথা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে যে মজলিশে কটাক্ষ করা হয় সে মজলিশে বসাও কুফুরী কাজ। তাছাড়া আল্লাহর রাসূলের কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা বলার অনুমতি

চাওয়াও কুফুরী। এতগুলো কুফুরী সত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অনুমতি দিলেন। কারণ শুধু একটাই আর তা হলো: একটা চরম দুষ্ট কাফের লিডারকে হত্যা করা। তবে এ ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত আছে: প্রথম শর্ত হলো– কোনো বড় কুফুরের মূলোৎপাটনের জন্য এ ধরণের কাজ করা যাবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো– এই প্রক্রিয়া ছাড়া যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে। তৃতীয় শর্ত হলো– একাজ করার সময় যথা সাধ্য প্রয়োজনের বেশী না বলা। চতুর্থ শর্ত হলো– শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাওরীয়া, তা'রীজ ও কিনায়াহ মূলক শব্দ ব্যবহার করা যাতে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম আর শ্রোতা বুঝে অন্য রকম। পঞ্চম শর্ত হলো– জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং মুজাহিদীনদের জন্যই কেবলমাত্র এ ধরণের বিষয়গুলো জায়েজ অন্যদের জন্য নয়। কেননা মুজাহিদীনদের জন্য এমন কিছু জায়েজ আছে যা অন্যদের জন্য জায়েজ নয়। যার বিস্তারিত দলীল-প্রমান কুরআন হাদীস ভালভাবে পড়লে জানা যাবে। ষষ্ঠ শর্ত হলো– যে এই কাজ করবে তার জন্য ইসলামের প্রতি দীর্ঘ ভালবাসা, ত্যাগ-কুরবানী, বড় বড় নেক আমল ও জিহাদ করার মতো আমল থাকতে হবে। কেননা বড় বড় নেক আমল মানুষের ছোট-খাট ত্রুটি বিচ্যুতি মিটিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেছেন:

'নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়।' (হুদ ১১:১১৪)
তেমনিভাবে হাতেব ইবনে আবী বালতা' এর ঘটনাটিও লক্ষণীয়। যখন মক্কা অভিযানের তথ্য ফাঁস করে মক্কার লোকদের পত্র লিখেছিলেন আর সেই পত্র ধরা পড়েছিলো তখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি জান না সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো, আর হতে পারে আল্লাহ (সুব.) বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উঁকি মেরে বলেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।' (বুখারী ৩০০৭)

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করার বাধ্যবাধকতা ও তার শর্তসমূহ

উপরের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান ভঙ্গের কারণ কি কি এবং সেগুলো পাওয়া যাওয়া সত্বেও কি কি কারণে তাকফীর করা

যাবে না। এখন আমরা আলোচনা করবো একজন ব্যক্তিকে কি কি কারণে তাকফীর করা জরুরী। কেননা কাফেরকে কাফের হিসেবে জ্ঞান করাও ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত কাফেরকে কাফের হিসাবে বিশ্বাস করে না মূলত সে নিজেও কাফের। তাই কি কি কারণে একজন মানুষকে কাফের হিসেবে আক্বীদা পোষণ করতে হবে তাও জেনে নেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত জরুরী। যে সকল কারণে একজন মানুষকে তাকফীর করা জরুরী সেগুলো নিম্নে পেশ করা হলোঃ

এক :

তাকফীরে বাঁধা প্রদানকারী কারণসমূহ বিদ্যমান না থাকা।

কারো থেকে কোনো কুফুরি কথা বা কাজ প্রকাশ পেলেই তাকে তাকফীর না করে দেখতে হবে সে কুফুরী কেন করলো। যদি উপরের আলোচিত কারণগুলো থেকে কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে তাকফীর করা যাবে না। এজন্য কাউকে তাকফীর করতে গেলে প্রথম শর্ত হলো উপরে উল্লেখিত বা তাকফীরে বাঁধা প্রদানকারী কারণসমূহ থেকে কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকা।

দুই :

যথাযথ যাচাই বাছাই করে সুনিশ্চিত হওয়া।

কারো ব্যাপারে যদি জানা যায় সে কুফুরী কাজ করেছে অথবা কুফুরী কথা বলেছে সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই না করে তাকফীর না করা। বরং যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করে তাকফীর করলে সে যদি বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে যে তাকফীর করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে সম্বোধন করে বলে, হে কাফের!। তাহলে দুজনের কোনো একজন অবশ্যই কাফের হবে (যাকে কাফের বলা হয়েছে সে যদি বাস্তবে কাফের হয় তাহলে তার উপরই প্রয়োগ হবে আর যদি সে বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে যে বলেছে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে)।’ (বুখারী ৬১০৩; মুসলিম ২২৫; তিরমিজি ২৬৩৭)

এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

'হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।' (হুজুরাত ৪৯:৬)
এ আয়াতে যাচাই বাছাই করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধারণা বা সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে তাকফীর করা যাবে না। কেননা ধারণা বা সন্দেহের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

'নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না।' (ইউনুস ১০:৩৬)
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেছেন:

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে (সন্দেহবশত) বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'।' (নিসা ৪:৯৪) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনি সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু ছাগল নিয়ে একদল সাহাবীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো। সে সাহাবীদের সালাম দিলো। সাহাবারা বললো, সে আত্মরক্ষার জন্য সালাম দিয়েছেন। এরপর তারা তাকে হত্যা করে তার ছাগলগুলো নিয়ে নিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট তা পেশ করার পর নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলো : 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে (সন্দেহ বশতঃ) বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'।' (তিরমিজি ৩০৩০)
তবে মনে রাখতে হবে যে, সুস্পষ্টভাবে যদি কেউ কোনো কুফুরি বা মুনাফেকি কাজ করে এবং তা প্রমাণীত হয় তার ভিত্তিতে তাকে কাফের বা মুনাফেক বলা হয়। কিন্তু তার বিশেষ কোনো কারণ বা অবদানের কারণে বাস্তবে কাফের না হয় সেক্ষেত্রে তাকফীরকারী বা মুনাফেক বলে

আখ্যাদানকারী নিজে কাফের বা মুনাফেক হবে না। এ প্রসঙ্গে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর হাদীসটি লক্ষণীয়। ওমর (রা.) তাকে মুনাফিক আখ্যা দিয়ে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনুমতি চাইলেন তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেই।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

'তুমি কি জান না সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। আর হতে পারে আল্লাহ (সুব.) বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উঁকি মেরে বলেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।' (বুখারী ৩০০৭)

এতটুকু বলেই ওমর (রা.) কে সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু তিনি ওমর কে বলেননি যে, তুমি মুনাফিক হয়ে গেছো। তোমাকে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। না! তা বলেননি। কেননা ওমর তাকে যাচাই বাছাই না করে অনুমানের ভিত্তিতে মুনাফিক বলেননি। বরং তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল। কিন্তু হাতেব ইবনে আবী বালতা' বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে রক্ষা পেয়ে যায়। সুতরাং বর্তমানে যারা সুস্পষ্টভাবে কুফুরী কথা বা কাজে লিপ্ত। যেমন: আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূলকে অথবা আল্লাহর আয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ব্যাঙ্গ করে। এমনিভাবে যারা আল্লাহর বিধান চোরের হাত কাটা, বিবাহিত জেনা-ব্যভিচারীকে পাথড় ছুড়ে হত্যা করা, সম্পত্তি বন্টনে নারীকে অর্ধেক দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে কটাক্ষ করে। এমনিভাবে যারা মূর্তি তৈরী করে, মূর্তির সামনে গিয়ে নিরবে দাড়িঁয়ে থাকে অথবা বিভিন্ন মূর্তির বেদীর পাদদেশে গিয়ে শপথ করে তাদেরকে যদি কোনো আলেম তাকফীর করে কিন্তু বাস্তবে তাদের কোনো বিশেষ আমল বা অবদানের কারণে আল্লাহর নিকট কাফের না হয়ে থাকে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এ জন্য উক্ত আলেমকে উল্টো তাকফীর করা বা খাওয়ারেজ বলা যাবে না। ওমর (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকফীরও করেননি আবার খাওয়ারেজও বলেন নি।

তিন : হুজ্জত কায়েম করা

কেউ যদি কোনো কুফুরি কথা বলে অথবা কোনো কুফুরি কাজ করে কিন্তু সে জানে না যে উক্ত কথাটি বা কাজটি কুফুরি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি তাহলে তার কাছে কুরআন সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণসহ বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেন:

'আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই।' (ইসরা ১৭:১৫) তিনি আরও বলেন:

'আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে।' (নিসা ৪:১৬৫) তবে যাদের কাছে পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে কিন্তু সে হঠকারীতা করে অথবা অলসতা করে অথবা পার্থিব কাজ-কর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জণ করেনি আর সেকারণে কুফুরী কথা বা কাজে লিপ্ত রয়েছে তাকে তাকফীর করার জন্য বা হত্যা করার জন্য নতুনভাবে দাওয়াত পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার তাদের তওবা করার জন্য আহবান করারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা অনেক ক্ষেত্রে এসবের কারণে তারা সতর্ক হয়ে যাবে এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তি চুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই যাদের কাছে ইসলামের বিধানগুলো স্পষ্ট হওয়ার পরেও কুফুরি কথা বা কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে হত্যা করার জন্য কোনো প্রকার নোটিশ, দাওয়াত অথবা তওবার আহবান করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করা যাবে। মক্কার কাফের-মুশরিদের ব্যাপারে সে হুকুমই জারী করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (তাওবা ৯:৫)

বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ ইলম অর্জণ করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা পার্থিব কাজ কর্ম ও ব্যাবসা বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দ্বীনি ইলম অর্জণ করতে অক্ষম এবং সে কারণে তারা বিভিন্ন কুফুরী কথা ও কাজে লিপ্ত হয় তাদের ব্যাপারে

বা না জানার ওজর পেশ করা যাবে না। বরং তারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জর্ণ করলো না তার জবাবদিহীতা করতে বাধ্য থাকবে।